অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

সিগ্‌নেট প্রেস কলিকাতা ২০

"কল্লোল"-এর
বন্ধুদের দিলাম

~ নীরদকে ~

— হরিপ্রভা —

১৫ই আষাঢ় ৪৮.

আহ্লাদি

ন' পেরিয়েছি, কিন্তু আহ্লাদিকে দেখেই আমার ভালো লাগল। জীবনারম্ভে সেই প্রথম ভালো-লাগাটি আজকের বিষণ্ণ অপরাহ্ণে ঠিক ধরতে পারছি না। সেটা ভৈরবী না ভূপালির সুর তাও বা কে বলবে?

—কাদায় প'ড়ে গিয়েছিলে বুঝি?

কথা বলতে পারছিলাম না। কাঁদছিলাম।

—ইস! কপাল কেটে যে রক্ত বেরিয়েছে।

চারটি আঙুল আমার কপালে এসে লাগল। দেখলাম ওর চারটি আঙুলের ডগা রক্তে টুকটুক করছে।

কোমরে কাপড় জড়ানো একটি ছেলে, খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, এসে বললে—তোকে মাস্টারমশাই ডাকছে, আহ্লাদি।

—কেন রে? বল গে আমি পারব না এখন উঠোন লেপতে। বামনি উনুনে আগুন দিক।

পাশের দেবদারু গাছটায় কচি পাতার জন্মোৎসব চলেছে। ভোরের বাতাস ঝিরঝির করছিল।

ছেলেটি বললে—আমি ফিরে গিয়ে যদি বলি যে আহ্লাদি আসবে না, আমার পিঠেই তো বেত ভাঙবে। তোকে তো আর ছোঁবে না। কিন্তু উঠোন লেপতে তোকে ডাকেনি। বামনিই লেপছে।

আহ্লাদি ফিরে দাঁড়িয়ে বললে—আমি এখুনি আসছি ভাই।

ছেলেটি আমার হাত ধ'রে ফেললে। বললে—বড্ড লেগেছে বুঝি? কেমন ক'রে লাগল?

—গঙ্গার ঘাটের সিঁড়ির কোণায় লেগে। পিছলে প'ড়ে গেছলাম।

—কলকাতায় এই বুঝি প্রথম এসেছিস? বাড়ি থেকে পালিয়ে না পথ ভুলে?

আহ্লাদি ছুটতে ছুটতে এল। হাতে একটা গেরুয়া রঙের কাপড়। ওর ছোট্ট তর্জনীটি হেলিয়ে বললে—এবার যাও তুমি মাস্টারমশাইর কাছে, বসন্ত ব'লে দিয়েছে তুমি কাল লুকিয়ে মাস্টারমশাইর হুঁকোতে টান মেরেছ। মাস্টারমশাই তাঁর পায়ের খড়ম উঁচিয়ে ব'সে আছেন, নটরুর পিঠ ভাঙবেন তবে হুঁকোয় টান দেবেন। যাও এবার!

নটরু কোমরের কাপড়টা আরো একটু ক'ষে বেঁধে একেবারে ক্ষেপে উঠল —বসন্ত বলুক দেখি তো আমার মুখের ওপর! জোচ্চোর কোথাকার! দেব থাবড়া মেরে শূয়োরের মুখ ভেঙে। আমি হুঁকো কোথায় তাই জানি না। যাবই তো মাস্টারের কাছে। আমি কেয়ার করি কি না! কিন্তু আগে বসন্তর দাঁত বত্রিশটা থেঁতলে না দিলেই নয়।

আহ্লাদি ওর হাতটা চেপে ধ'রে বললে—সক্কালবেলাই মারামারি করতে ছুটিসনি নটরু!

আহ্লাদির মুঠি ভারি কোমল কিন্তু। নটরু তাতে বাঁধা পড়ে না।

আমার হাত ধ'রে ও বললে—এস ভাই।

প্রকাণ্ড অশ্বত্থ গাছ, ছায়া পড়েছে। মা'র কোলের মতো! একটা ডোবা, ঘাট বাঁধানো নয়, পানায় জল নীলচে হয়ে এসেছে, কলমিলতা ভাসছে, দুটো হাঁস পাঁক খুঁড়ছে।

আহ্লাদি আমার কপালে জল দিয়ে দিতে লাগল।

—এখানে কি ক'রে এলে ভাই?

—মামার সঙ্গে কলকাতায় আজ ভোরেই পৌঁছেচি।

—মামা? তিনি কোথায়?

—তিনি আমাকে গঙ্গার ঘাটে ফেলে রেখে কোথায় যে চ'লে গেলেন, পাত্তা পেলাম না।

ছেলেরা নামতা মুখস্থ করছে। বেতের আওয়াজ আর আর্তধ্বনিও কানে ভেসে আসছিল।

—তাঁর নাম কি? কোথায় তোমাদের গাঁ?

—তা বলব না। সেখানে আর ফিরে যেতে চাই না।

—কেন ভাই?

চোখে জল এসে পড়েছিল।

—আমাকে ওরা মারে। মামী একদিন একটা বঁটি ছুঁড়ে মেরেছিল।

পিঠের কাপড়টা তুলে দেখালাম।

আহ্লাদি আমার পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ল দুই হাত রেখে। ওর দুটি হাতই ভেজা। চুলগুলিও খোঁপায় জড়ানো ছিল না।

আহ্লাদির তখন কত বয়সই বা হবে? এগারোর বেশি?

—কিন্তু মামা যদি একদিন নিতে আসে?

—তা হলে বুঝি লুকিয়ে গঙ্গার ঘাটে ভিড়ের মধ্যে হাত ছেড়ে পালিয়ে যায়?

—মাস্টারমশাই যদি তোমাকে বাড়িতে রেখে দিয়ে আসেন ?

—তিনি যখন গঙ্গাস্নান ক'রে ফিরছিলেন, আমাকে কাঁদতে দেখে ডেকে নিলেন সঙ্গে। তাঁকে সব বলেছি, তিনি আমাকে এখানে রাখবেন বলেছেন।

—সত্যি ?—আহ্লাদির দুটি চোখ ছেপে খুশি উছলে উঠেছে।—বেশ হবে কিন্তু তা হলে। তোমার নাম কি ভাই ?

—পচা।

—ধ্যেৎ !—আহ্লাদি ভুরু কুঁচকেছে।—তোমার নাম কাঁচা। এই নাও, ভেজা কাপড়টা ছেড়ে এই আলখাল্লাটা পর।

কাপড়টার রঙ গেরুয়া।

মাস্টারমশাই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

এটাকে ইস্কুল না ব'লে আস্তাবল বলতে কারুর বাধবে না হয় তো।

নটরু মাস্টারের কাছে বাইরে যাবার অনুমতি চাইল।

—না।

—থাকতে পারছি না স্যর, কল্ড্ বাই নেচার—

—পাজী, নচ্ছার—মাস্টার মেহেদির ভাঙা ডাল দিয়ে নটরুর ঘাড়ের উপর সপাং করলে। কিন্তু নটরু প্রকৃতির আহ্বান অবহেলা করতে শেখেনি—আর যায় কোথা ! সমস্ত ইস্কুলঘরে যেন আগুন লেগে গেছে। নটরুর নাক কেটে গেছে তবু মাস্টার ক্ষান্ত হয় না।

নটরুকে বেঞ্চির উপর দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। সে দুই হাতে চোখের জল কানের দিকে ঠেলে দিয়ে বইয়ের আড়ালে মুখ লুকিয়ে ভেঙচে নিচ্ছে।

আহ্লাদি গোলমাল শুনে দরজা পর্যন্ত এসেছিল। নটরুর মুখ-ভেঙচানো দেখে মুচকে একটু হেসে গেল। নটরু কি ওর হাসিকেও ভেঙচায় ?

—লেখাপড়া কিছু জানিস, না একেবারে স্বরে-অ ?

—গাঁয়ের ইস্কুলের সিক্‌স্‌থ্‌ ক্লাশ সারা হয়েছে, এবার—

—বেশ, অঙ্ক কদ্দূর ?

—জি সি এম্‌।

সব ছেলেগুলি হাঁ হয়ে গেছে দেখছি। নটরুর মুখে ইংরিজিটা তা হলে নিতান্ত অকেজো, তুচ্ছ। ওটা ওদের বুলি শেখানো হয়েছে। কেন না একটি পাঁচ বছরের ছেলে মুখখানি কাঁচুমাচু ক'রে এসে বললে—আই এম্‌ কল্‌ বাই নেচার স্যর ! নটরু তো হেসেই খুন !

আমাকে একটা ভাগ দিয়ে বললে—পাঁচ মিনিটে—

দু'মিনিট বেশি লেগে গেল বুঝি। মাস্টার তো সপাং ক'রে বেতের বাড়ি মেরে দিল। অঙ্কটা শুদ্ধ্‌ হয়েছিল কিন্তু। তাতে কি যায় আসে ? ডিসিপ্লিন্‌ ! ছেলেগুলো কিন্তু গুণও জানে না।

গঙ্গার ধারে যে-লোকটি আমার হাত ধরেছিল তার দুটি উদাস চোখের করুণা দেখেছিলাম, এখন দেখি লোকটির সারা মুখে বসন্তের দাগ, নাকের নিচে প্রকাণ্ড একটা ঘা হয়ে শুকিয়ে কদর্য একটা দাগ হয়ে আছে !

কেরোসিনের বাক্স সাজিয়ে বেঞ্চি। আশ্রমের কর্তা যথেষ্ট টাকা দিচ্ছে না ব'লে এখনো কিছুই তৈরি হল না—এ-কথা মাস্টার এরই মধ্যে বার পাঁচ সাত উল্লেখ করলে। সেটাকে বোর্ড বলা চলে না। তক্তা। একটা অঙ্ক লিখতে লিখতে মাস্টার বলতে লাগল—অনাথ আশ্রমটা যেন দেশোদ্ধারের তালিকায় কিছুই না।

একটা যোগ অঙ্ক লিখতে না লিখতেই মাস্টার হেঁকে উঠল—সাত মিনিট—

সমস্ত ছেলে চঞ্চল হয়ে উঠল। আমাকে মাস্টার একটা ভাঙা শ্লেট আর কড়ে আঙুলের আধখানা একটা পেন্সিল দিলে। টপাটপ অঙ্কটা ক'যে ফেললুম একেবারে।

আমাকে শ্লেটটা মাস্টারের হাতের কাছে বাড়িয়ে দিতে দেখেই সব ছেলে-গুলো যেন উন্মাদ হয়ে উঠল। অঙ্ক যে ক'রে হোক শেষ ক'রে সব একেবারে ভিড় ক'রে এসে দাঁড়াল। নটরু কিন্তু দেয়ালে ঠেস দিয়ে তেমনিই দাঁড়িয়ে আছে। নির্বিকার!

শুধু আমার অঙ্কটাই রাইট হয়েছে। মাস্টার আর সবাইকে ঠেলে দিল। ছেলেগুলি যে যার জায়গায় গিয়ে হাত মেলে দাঁড়িয়েছে। কেন রে? মাস্টার বেতটাকে শূন্যে দু'বার রিহার্সাল দিইয়ে নিয়ে গুনে গুনে ছেলে-গুলির কচি কচি হাতে পাঁচ-সাত নয়-বারো যেমন খুশি সপাং করতে লাগল। নটরুর কাছে এসে হাঁকলে—তেইশ!

নটরু চেঁচিয়ে উঠল—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঙ্ক কি ক'রে হয়?

মাস্টারের কথার নড়চড় হয়নি। একটি একটি ক'রে দু'কুড়ি তিন হল তো হল। মারাই তো মাস্টারের পেশা।

আমার অঙ্ক রাইট হওয়াটা প্রকাণ্ড অপরাধের মতো মনে হচ্ছিল।

ইস্কুল ভেঙে গেল।

রোজ এমনি ক'রেই ভাঙে। মাস্টারের হাতের ও জিভের ব্যায়াম হয় খুব, আর নটরুর মাড়ির আর দাঁতের।

অশ্বত্থের পাতায় রোদ পিছলে পড়ে—ছেলেরা শ্লেটখাতা বগলে নিয়ে

বানের জলের মতো বেরিয়ে আসে। আটটায় ইস্কুল শেষ ক'রে এবার আমাদের মাটি কোপাবার পালা। এটা আশ্রমকর্তার ইস্কুল-পরিচালনার নতুন রুটিন।

ছেলেরা খাপরার ঘরে তাদের ছেঁড়া খাতাবই ছড়িয়ে রেখে এসে কোদাল নিয়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যায়। নটরু এখানে 'ফার্স্ট বয়'। আমার হাতে একটা কোদাল দিয়ে বললে—কোপা।

মাটির গন্ধে বুক ভ'রে আসে। হাঁটু পর্যন্ত মাটি, মাথায় মাটি—যেন এতগুলি ছেলের কোন একটি মা তাঁর স্নেহ বেঁটে দিচ্ছেন। মাস্টার একটা দেবদারুর চারা-গাছের তলায় ব'সে দেখে আর হুকুম করে। মাঝে মাঝে আহ্লাদি ছুটে এসে ছুটে চ'লে যায়। যেন গেরুয়া মাটির দেশে তরতর ক'রে একটি রজতলেখা নদী বয়ে গেল।

গঙ্গা গাং নয়—খাল। তখন তা শিটিয়ে এসেছে।

নটরু ছেলের দলের পাণ্ডা হয়ে গঙ্গাস্নান করতে নিয়ে আসে। মাস্টার সাঁইত্রিশ মিনিট কবুল ক'রে দেয়—অথচ লোহার ঘড়িটা নিজের ট্যাকেই রাখে। আমাদের সাঁইত্রিশ মিনিট তাই সাতান্নতে গিয়ে ঠেকে। ভাত খাবার আগে পেট ভ'রে আর একবার মার খেয়ে নিই।

নটরু ট্যাক থেকে বিড়ি আর দেশলাই বার করলে।—খাবি ?

মতামত দেবার আগেই নটরু ধরিয়ে ধোঁয়া দিতে শুরু করেছে। কৌতূহল যে হচ্ছিল না তা নয়। বললাম—মাস্টারকে যদি ওরা ব'লে দেয়—

নটরু একগাল হেসে বললে—তোরা ব'লে দিবি নাকিরে বসন্ত ?

—পাগল ! কোনোদিন বলেছি ?

বললাম—তুই যে মাস্টারের হুঁকোয় টান দিয়েছিলি সে-কথা তো বসন্তই ব'লে দিয়েছিল ! আহ্লাদি বললে ।

—আহ্লাদি বললে ?—বসন্ত রুখে উঠেছে ।—ছুঁড়ি ভারি মিথ্যুক তো ! হাঁরে, বলেছি নটরু ? তা হ'লে আমারই কি দাঁত ক'টা আস্ত থাকত ?

বললাম—না না, আহ্লাদি মিথ্যে বলেনি, ঠাট্টা করেছে ।

বিড়িতে টান দিতে হ'ল বৈকি ! কিন্তু পাঁজরা দু'খানা খ'সে পড়তে চাইল । বসন্তটা হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে । লজ্জা ঢাকতে গিয়ে আমিও হাসছি, আরো টানছি, আরো পাঁজরা চিমটে যাচ্ছে । বিড়িটা নিবে গেল । যেন বাঁচলাম ।

নদীর পাড় বেশ ঢালু । পলি মাটির কোমল কাদায় সমস্তটা পাড় পিছল হয়ে নেমেছে । ছেলেগুলি পারের ধারে ব'সে হাত ছেড়ে দিয়ে ছরছর করতে করতে জলের মধ্যে এসে পড়ছে । বেজায় ফুর্তি । নটরুর পর্যন্ত । একহাঁটু জলের মধ্যে খলবল করছে । ওরা সাঁতার জানে না । তবু নটরুই ওদের পাণ্ডা !

সাঁতার কাটতে কাটতে মনে হল আহ্লাদি এলে বেশ হত ! কত মেয়েরাই তো আসছে, নাইছে, চুল ধুচ্ছে, গাল ফুলিয়ে জল কুলকুচো করছে । মাস্টার না আসে—না আসুক ! কিন্তু আহ্লাদি যদি আসত, আমি ডুব সাঁতার দিয়ে ওর পা ছুঁয়ে যেতাম । ছুঁয়েই সাঁতরে—হোই দূরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতাম । ভাবত, মাছে ঠোকর দিয়ে পালিয়েছে বুঝি ।

আহ্লাদি আসে না ।

—এবার ফিরে চল নটরু । দেরি হয়ে যাবে ।

নটরু কেয়ার করে না । বলে—দেরি না হ'লেও বরাতে মার আছেই

আছে। মাস্টারের ট্যাঁক থেকে ঘড়ি আর কে ছিনিয়ে দেখতে যাচ্ছে? ঘড়ি দেখতে জানিস তুই?

হারান বললে—ঘড়ি আজ তিনদিন বন্ধ। ষাট গুনে গুনে ওর মিনিট।

মারকে ওরা ডরায় না। ওটা ওদের দৈনন্দিন বরাদ্দের মতো। নটরু ওর দল নিয়ে পার বেয়ে বেয়ে জলে ঝাঁপাতেই থাকে। পাল্লা দেয়—লাইন বাঁধে—যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলে; নদীটা ওদের বিপক্ষ, ওকে এক সঙ্গে আক্রমণ করা হচ্ছে—এমনি।

আমি উঠে আসি। আহ্লাদি হয় তো সেই ডোবাটায় গা ডোবায়। ইস!

ডিম-ওলা ট্যাংরামাছটা আমার পাতে পড়তেই নটরু খাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। ভাবলাম, ঠাট্টা করছে বুঝি।

আহ্লাদি মাছের বাসনটা হাত থেকে মাটিতে নাবিয়ে শুধোল—কি হল রে নটরু?

বললাম—ডিমটা চাস, না খালি মাছটা?

আহ্লাদি হেসে উঠল। নটরুর মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

—নে নে গোটা মাছটাই নে।

পাত থেকে মাছটা তাড়াতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে নটরু বললে—তোর পাতেরটা আমি খাই কিনা!

ছুটে যাচ্ছিল, আহ্লাদি ওর হাত ফের ধ'রে ফেললে।

—ছাড়, আমার খিদে নেই আহ্লাদি।

আমরা এঁটো কুড়িয়ে পাতাগুলি আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসি। আহ্লাদি গোবর দিয়ে মাটি লেপে, কোমরে কাপড় জড়ায়।

তারপর আমাদের দু'তিন ঘণ্টা ছুটি। যা খুশি তাই করি। যার খুশি ডাংগুলি, যার খুশি গাব্বু গুলি, যার খুশি দোলনা-দোলনা।
গত রাতের বৃষ্টিতে কাঁচা পেয়ারাগুলি বুঝি ভাঁসিয়েছে।
নটরু আগডালেতে চ'ড়ে বেছে বেছে .পেয়ারা নিচে আহ্লাদির ছোট্ট কোঁচড়টিতে ছুঁড়ে মারছে। ওর কোঁচড় ভ'রে গেল।
—আমায় একটা দিবি রে নটরু?—তলায় এসে দাঁড়ালাম।
হঠাৎ নটরুর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়ে গেল। একনাগাড়ে তিন-চারটে পেযারা আহ্লাদিব কোঁচড়ে না প'ড়ে একেবারে আমার কপালে মাথায় এসে লাগতে লাগল।
ওর হাতের টিপ-এর এ হেন ভুল দেখে আহ্লাদি ব্যস্ত হযে আমার মাথাটা দু'হাতে ধ'রে ফেলে বুকের কাছে টেনে এনে বললে—ওকি, ওকে মারছিস যে?—কোঁচড়ের আশ্রিত সমস্তগুলি পেয়ারাই কিন্তু তখন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে।
নটরু একেবারে তরতর ক'রে নেমে এল।
—তুই আমার সব পেয়ারা মাটিতে ফেলে দিলি যে! ব'লেই আহ্লাদির গালে সাঁ ক'রে এক চড়।
ন'বছরের কাঁচা মাংসে পাতলা রক্ত টগবগ ক'রে উঠল বুঝি। ঝাঁপিয়ে পড়লাম।
পেয়ারা আমাদের বন্দুকের গোলা, মরা ডাল আমাদের সঙীন আর তলোয়ার।
যুদ্ধে হেরে যাই। পুরনো ঘায়ে আঁচড় লেগে রক্ত ফিনিক দিয়ে ছোটে। আহ্লাদির চোখে জল, তবু গাঁদার পাতা থেঁতলে ঘায়ের মুখে চেপে ধরছে আমার।

নটরু কোমরে কাপড়টা ক'ষে বাঁধতে বাঁধতে বললে—মাস্টারকে যদি বলিস যে মেরেছি, তা'লে তোর নাকটা চেপটে দেব। ব'লে রাখছি আহ্লাদি। আহ্লাদি মাস্টারকে বলে না বটে।

দুপুরের ইস্কুল জমে না কোনো দিন। মাস্টার হুঁকো নিয়ে আসে, ঝিমোয়। বেত মারার উৎসাহ তখন মিইয়ে আসে, অতিকষ্টে হাত বাড়িয়ে শুধু চিমটি, কি বড় জোর পা বাড়িয়ে বেঞ্চির তলা দিয়ে লাথি। ছেলেদের কড়াকিয়া বলতে হুকুম দেয়। ছেলেরা কলরব করে। মাস্টারের তাতে ঘুম আসে। হুঁকোর জ্বলন্ত কল্‌কেটা কোলের উপর প'ড়ে যায় হয় তো। মাস্টার বিকট চেঁচিয়ে ওঠে। ছেলেরা হাসে। মাস্টার একজনকে মেহেদির ডাল ভেঙে আনতে বলে। তার পিঠে আগে পঁচিশ ঘা মেরে মাস্টারের বউনি হয়। যেদিন কল্‌কে পড়ে না, সেদিনটা নিশ্চিন্তে কাটে। নটরু কতদিন আলগোছে কল্‌কেটা হুঁকোর মুখ থেকে তুলে সরিয়ে রেখেছে। নিমগাছের ছায়া ছড়িয়ে পড়তেই বুঝি চারটে বেজেছে। একসঙ্গে আমরা দুপদাপ ক'রে উঠি। মাস্টারের ঘুম ভেঙে যায়। ট্যাঁকের ঘড়িটা লুকিয়ে একবার দেখে ছুটি দিয়ে দেয়। পরে ফের জিগগেস করে—নিমগাছের ছায়া পড়েছে তো রে?—ব'লে জানলার দিকে এগিয়ে আসে।

বিকেলে যেদিন ভিক্ষার মিছিল নিয়ে বেরুতে না হয় সেদিন ফের মাটি কোপাই। বেগুনের চারাগুলি মাটির অবগুণ্ঠন খুলে আকাশকে একটুখানি দেখে নিচ্ছে। মিছিলে এবারো আহ্লাদি আসে না, ঘর নিকোয়, ঝাঁট দেয়, মাস্টারের জন্য তামাক সাজে।

মাথার ঘা তখনো টনটন করলে কি হবে, নটরুর সঙ্গে ভাব ক'রে ফেললাম ফের। খালি চাটাইটার উপর শুয়ে লাগছিল। নটরু ওর বিছানায় নিশ্চয়ই ভাগ দিত না। কেই বা চায়? আমারো বিছানা আসবে দু'একদিনেরই মধ্যে—মাস্টার তো বললে।

—চিড়িয়াখানা দেখিস নি?

—কি ক'রে দেখব? দেখাবি?

—ওরে বাবা, পঞ্চাশটা হাতি বাহাত্তরটা গণ্ডারের সঙ্গে শুঁড় দিয়ে লড়ে।

—ক'টার ভাগে ক'টা ক'রে পড়ে তা'লে?

—তা কে জানে? সিংহগুলো সার বেঁধে দাঁড়ায়, বনমানুষের সঙ্গে যুদ্ধ হয়। ভীষণ জায়গা। ঢুকতে মোটে সাত পয়সা। আছে তোর কাছে?

—আহ্লাদি যে বললে এক আনা ক'রে লোকপিছু, বাকি তিন পয়সার বিড়ি কিনবি বুঝি?

নটরু চ'টে উঠেছে।—আহ্লাদি তো সবই জানে! রাস্তাই চেনে না, এক আনা! হেঁঃ!

বেড়ার একটা দিক মেরামত সারা হয়নি এখনো। অশ্বত্থ গাছের গোড়া থেকে আগাগোড়া অন্ধকারে আমাদের ঘর ভরা!

বললাম—আহ্লাদি এখানে কি ক'রে এল রে?

—কে জানে? আহ্লাদিকেই শুধোস!

—এতগুলো ছেলের মধ্যে ও কোত্থেকে ভেসে এল। ষোলঘরের নামতা পড়তে পড়তে ও যেন হঠাৎ একঘরের নামতা—ভারি সোজা।—ঘুমুচ্ছিস নটরু?

নটরু পাশ ফিরেছে। মাস্টারকে জিগগেস করলেও খবর পেতে পারিস।

—তার মানে মাথার ঘা-টা আর না শুকোক এই তোর ইচ্ছে!

—রাখ ঘুমো। রাত ঢের হল। সাঁঝের তারাটা কতদূর উঠে এসেছে দেখেছিস ?

নস্তুটা বেজায় কাশছে। একবার এ-পাশ আরবার ও-পাশ। খুকখুক খুকখুক—ঠায় শুতে পাচ্ছে না। বালিশটায় মাথা গুঁজে হামাগুড়ি দেবার মতো ক'রে একটু শু'ল।

—ওর কি হল ? নস্তুর ?

—হাঁপানি। রোজ কাশে। বেচারা ঘুমুতে পারে না চোখ ভ'রে কোনো রাতে। কিন্তু গা-সওয়া।

—না রে, দেখছিস না কেমন হাঁসফাঁস করছে।

—থাক, আমাকে ঘুমুতে দে বলছি। আর বকবক করলে মুখে থুতু দেব।

নটরুটা একটুতেই চটে।

নিঝুম। চোখ বুঁজে প'ড়ে ছিলাম হাতের উপর মাথা রেখে, হঠাৎ যেন কে এল। চোখ চেয়ে দেখি—আহ্লাদি।

—চাটায়ে শুয়ে ঘুম আসছে না, না রে ?

—আসবে'খন।

—এই আমার বালিশটা নে। পরশু থেকেই কাঁথা পাবি।

আহ্লাদি আমার মাথাটা দুই হাতে তুলে বালিশটা ঘাড়ের তলায় গুঁজে দিয়ে চ'লে গেল।

বালিশটায় সোঁদাল গন্ধ ভুরভুর করছে। মামা একদিন আমার দু'হাত কড়িকাঠে বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিল, মামীর বঁটির দাগ আজো মেরুদণ্ডের কাছে ধনুকের মতো বেঁকে আছে ভুলে গেলাম, ভুলে গেলাম মাথায় আমার এর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত জ্বালা করছিল।

সকালবেলা চেয়ে দেখি বালিশটা আশ্চর্যরকম স্থান পরিবর্তন করেছে

কিন্তু। আমার ঘাড়ের তলা থেকে একেবারে কখন যে নটরুর বুকের তলায় পৌঁছেচে আবিষ্কার করা কঠিন'। তাড়াতাড়ি ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম। ভোরবেলাকার ঘুমে মানুষকে কী সুন্দর দেখায় সেদিন নটরুর মুখের দিকে চেয়ে বুঝেছিলাম। সেদিন নটরুর আর ঘুম ভাঙিনি।

আমাতে বসন্তে দারুণ খোঁজাখুঁজি। সুতোয় মাঞ্জা হল, লাটাই এল, ঘুড়ি তৈরি—নটরু নেই। পিটালি গাছের তলায় নটরু ব'সে। এগিয়ে দেখি পা ছড়িয়ে ব'সে ও পুঁতির মালা গাঁথছে।

—কিরে, ঘুড়ি ওড়াবি আয়!

—আজ আর নয় ভাই, কাজ আছে।

হাসি পায়, নটরুর কাজ! বসন্ত পুঁতিগুলি ছড়িয়ে দিয়ে বললে—ঘোড়ার ডিম।

নটরু সোজা দাঁড়িয়ে উঠেই বসন্তের পেটে এক লাথি।

—শিগগির গুছিয়ে দে বলছি, নইলে পিলে ফাঁক ক'রে দেব, রাস্কেল।

বসন্ত গুছিয়ে দিলে। নটরু ফের পা ছড়িয়ে মালা গাঁথতে বসল। অথচ কাল সারা দুপুরের ছুটিতে ঘুড়ি লাটাই নিয়ে কত তোড়-জোড়। চড়কপুকুরের ছোঁড়াদের ঘুড়ি শুধু কাটবে না, লটকাবে।

—পুঁতি কোত্থেকে জোগাড় করল রে বসন্ত? কিনল?

—হ্যাঁ।

বসন্তর খুব লেগেছে।

—পয়সা কোথায় পেল? জানিস?

—তোকে বলব, কিন্তু ওকে বলিস নে, খবরদার। বলবি না তো?

—কক্ষনো না, কক্ষনো না।

—বললে এবার তা'লে পাঁজরা চুর হবে ভাই! শুনবি কি ক'রে পয়সা পেল? পরশু মিছিল ক'রে যাবার সময়—তুই, মাস্টার সব এগিয়ে ছিলি—একটা অন্ধ ভিখিরী লোহার পুলের কাছে ব'সে ভিক্ষে করছিল। পাশে তার একটা টিনের বাটি, বাটিটা নটরু খপ ক'রে তুলে নিয়ে পয়সাগুলি মুঠিতে চেপে বাটিটা ড্রেনে ছুঁড়ে দিলে; সাত আনা—আটাশটা পয়সা ভাই। বললাম—একপয়সার ঝাল্‌চানা কিনে দে নটরু। দিলে না। ঐ আটাশটা পয়সা দিয়েই পুঁতি কিনলে।

—পুঁতি? কি করবে ও দিয়ে?

—কে জানে?

সন্ধ্যার দিকে সবাই জানলাম। সেই পুঁতির মালা আহ্লাদির গলায় দুলছে।

সে-রাত্রে নটরুর পাতে আস্ত কৈ মাছ পড়ল, দু'খানা বেগুন ভাজা, দু'হাতা টক।

আমার খালি চাটাই-ই ভালো। কিছু না ব'লে বালিশটা নটরুর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। বালিশটা তেমনি ওর বুকের তলায় গিয়ে সেঁধোল। নন্তুর কাশি থামে না। ওর পাশে ব'সে বুকে একটু হাত বুলিয়ে কে দেবে।

বামনিকে বললাম—বামনি, আমাকে সাতআনা পয়সা দিতে পারিস?

বামনি দাঁত বার ক'রে হাসে।—পয়সা দিয়ে কি করবি রে পচা?

বামনি আমাদের বাজার আর রান্না করে। পরিবেশন করে আহ্লাদি।

বললাম—ধারই না হয় দে।
—কি ক'রে শুধবি ?
আমার গালটা টিপে দেয়।
—মাস্টারের এতগুলো দোক্তা তোকে দেব বামনি।
—চুরি ক'রে নাকি রে ?
আমার ঠোঁট দুটো আবার টিপে দেয়।
বাটনা বেটে বেটে বামনির আঙুলে কড়া পড়েছে।

ইস্কুল যেই ভাঙল, পথে বেরিয়ে এলাম। ধূলার চিঠিতে ডাক পড়েছে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—পথের পর পথ ভাঙছি। গাছের ছায়া গাছের তলায় গুটিয়ে এসেছে।
—আমাকে একটা টাকা দেবেন ?
জুড়ি-গাড়ির মেয়ে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়। সঙ্গিনীর পানে চেয়ে মুচকে হেসে বলে—টাকা ? টাকা দিয়ে কি করবে ?
ঢোঁক গিলে বললাম—আমার মা আজ তিনদিন উপোসী—আমরা ভারি গরিব, আমার মা'র বড্ড অসুখ, পেটে ভীষণ ব্যথা।
চোখে জল এসে পড়েছিল। মা'র কথা বললেই চোখে জল আসে।
সঙ্গিনী বলে—কি আস্পর্ধা ভিখিরী-ছেলেটার। টাকা চায়।
একটি ছেলে দোকান থেকে একটা এসেন্স কিনে এনে পথের পাশে দাঁড়ানো গাড়ির পা-দানিতে পা রাখতে যেতেই এই কথাটি শুনলে।
—যা যা বেরো, টাকা চাস, টাকায় ক' পয়সা জানিস ?

আমি দূরে দাঁড়িয়ে মেয়েটির পানে চেয়ে বলি—আমার মা কাল রাতে অনেকগুলি বমি করেছিল, তাতে রক্ত উঠেছে। টাকা নেই ব'লে ওষুধ নেই। আমার মা খুব যে কাঁদে।

ছেলেটি এসেন্সের ছিপি খুলে মেয়েটির চুলে, বুকের কাছের কাপড়গুলিতে লাগিয়ে দিচ্ছে। মেয়েটির গালে চিবুকে ঠোঁটে চোখের কোলে হাসির হাসনুহানা! এসেন্সের গন্ধে সমস্ত রাস্তা মাতোয়ারা।

একটা এসেন্সের শিশির দাম কত? এক টাকারও বেশি?

পথের পাশে ব'সে পড়েছি। যে-হাত মাস্টারের বেতের জন্য মেলে ধরতে অভ্যস্ত হয়েছিল তা এখন পয়সার জন্য প্রসারিত হচ্ছে। বেত পড়তে পারে, পয়সা পড়ে না।

—বিকেলে বাড়ি গিয়ে আমার মা-কে হয় তো আর দেখতে পাব না। ওরা নিশ্চয়ই টেনে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে মা-কে কেওড়াতলায় নিয়ে যাবে। বাবু, একটা পয়সা দিয়ে যান।

দু'ঘণ্টায় দু'টি পয়সা রোজগার হয়।

একটা চীনাবাদামওলা হেঁকে যাচ্ছিল। তখন পথের কাঁকরগুলিও চিবিয়ে খেতে পারি। ডাকলাম—এক পয়সার মিশিয়ে দে।

না, থাক। হয়তো যা কিনতে যাব, তা দু'পয়সা কম পড়বে ব'লেই কেনা যাবে না। এ-রাস্তার মোড়টা ভারি অপয়া নিশ্চয়। আবার পথ! তার শেষ আছে?

আরো বাষট্টি পয়সা।

প্রকাণ্ড মাঠ; বেজায় ভিড়। একদিনে সবাই যেন ঘর ছেড়েছে জোট বেঁধে!

—কি মশাই এখানে?

—খেলা ; ফুটবল।

চেঁচামেচিতে আকাশের কানে তালা লেগেছে। মাঝে মাঝে ভিড়ের মধ্য দিয়ে মাথা গলাতে চাই, কনুইয়ের গুঁতো খাওয়ায় মাথা তখনো অভ্যস্ত হয়নি।

ভদ্রলোক খপ ক'রে আমার হাতটা ধ'রে ফেললে। চারপাশে লোকারণ্য জমে গেল।

—এই টুকুন ছোঁড়া, আমার পকেটের মধ্যে হাত চালিয়ে একটা টাকা সরিয়েছে। দে শিগগির!

চাঁটির পর চাঁটি, চড়ের পর চড়, চুল ধ'রে দারুণ ঝাঁকুনি! টাকাটা তখন আমার মুখের মধ্যে জিভের তলায়।

আর একজন বললে—পুলিশে দিন মশায়, সায়েস্তা হোক।

—পুলিশ কি হবে? আমরা আছি কি করতে?

আমার দুটো গাল কে একজন ভীষণ জোরে চেপে ধরল, দাঁতগুলো মড়মড় ক'রে উঠেছে। টাকা তবু ছাড়ি না।

পুলিশকে খবর না দিলেও আসে। লাল-পাগড়ি দেখে সমস্ত গা কালিয়ে এল।

ভিড় হালকা হয়ে গেল। পুলিশ আমার কাছে এসে বললে—দে-দো।

টাকাটা মুখ থেকে বার ক'রে কাপড় দিয়ে মুছে ওর চকচকে মুখখানির পানে একবার চেয়ে পুলিশের হাতে দিয়ে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য বলতে হবে। পুলিশ আমার হাত ধ'রে টানতে টানতে নিয়ে গেল না। টাকাটা হাতে ক'রে বেমালুম সোজাই চলেছে—এতবড় রাজত্বে সর্বত্রই শান্তি ও শৃঙ্খলা, ওর মুখে সেই ভাব স্পষ্ট আঁকা।

কিন্তু পিছনে ওর ভিড় লেগে গেল।—টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

পুলিশ সে-কথায় কোনো কানও পাতে না। আপন মনে এঁকে বেঁকে চলে। ভিড়ের সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের পিছু পিছু আমিও চলি। পুলিশের পিছু নিয়ে আমাকে সবাই ভুলে গেছে।

ছেলেটিকে ভারি সাহসী বলতে হবে—পুলিশের রুলসুদ্ধু হাতটা ধ'রে ফেলে বললে—টাকা নিয়ে কোথায় ভাগছিস ?

—কিসের টাকা ?

পুলিশ বুক চিতিয়ে রুখে দাঁড়ায়।

কে একজন খাপ্পা হয়ে তার সমুখের লোকটিকে পুলিশের গায়ে ঠেলে ফেললে। পুলিশ ধাক্কা খেয়ে মাটিতে একেবারে উপুড় হয়ে পড়ল, তার পাগড়ি গড়িয়ে গেল। মার মার শালাকে।

একটা হুলুস্থুল ব্যাপার। ভিড় পিছন হটে দাঁড়াল। আমিও স'রে যাচ্ছিলাম, দেখি পায়ের কাছে কি একটা গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকছে। তুলে নিয়েই ছুট। তখন সবাই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে। কেননা—

পুলিশ ওর রুল বাগিয়ে নিয়ে মরিয়া হয়ে ভিড়ের মধ্যে অন্ধের মতো চালাতে শুরু করেছে। একটি ছেলের মাথা ফেটে রক্তের ফোয়ারা, আরেকজন অজ্ঞান। লাল-পাগড়ির জোয়ার ডেকে এল—একটা প্রকাণ্ড হৈ চৈ।

হাঁপাতে হাঁপাতে একটা গাছতলায় এসে নেতিয়ে পড়লাম। কাপড়ে ফের মুছে নিয়ে ওর চকচকে মুখখানা দেখতেই বুকটার মধ্যে ঝিরঝির ক'রে বাতাস বয়ে গেল। যেন আমার মা কোন দূর দেশ থেকে আমার হাতের তালুতে ছোট্ট একটি চুমু পাঠিয়ে দিয়েছে।

শুয়ে পড়ি। ইচ্ছে করে ফের আহ্লাদি ওর দুই হাতে ঘাড়টা তুলে তলায় ওর ময়লা গন্ধওলা বালিশটা গুঁজে দিক।

মাঠ শুধু প্রকাণ্ড নয়, বাজারও প্রকাণ্ড—আলোয় আলোয় ঝলমল করছে। ঢুকতে গা ছম্‌ছমায়।

কি কিনি? দিশা পাই না।

সামনেই একটা পুতুলের দোকান। এগিয়ে গিযে শুধোলাম—আমাকে একটা ডল্ দেবে?

দোকানি হাসে, ঠাট্টা ক'রে বলে—মাগ্‌না?

—না, না; কম দামের মধ্যে। আমার ছোট বোনটি তিন দিন ধ'রে একটা পুতুলের জন্য কাঁদছে, দুধের বাটি ফেলে দিচ্ছে, কাঁদতে কাঁদতে তার জ্বর হয়ে গেল। তার জন্য একটা ভালো দেখে ডল্ দাও। এটার দাম কত?

—বহুৎ। এটা নাও। দাম দু আনা।

দোকানি আমাকে ভেবেছে কি? বলি—এটা?

—পাঁচসিকে।

—আর কিছু কমিয়ে দাও না! বোনটির যে পুতুলটা ভেঙে গিয়েছিল সেটা ঠিক এমনিই দেখতে—এমনি নীল চোখ, এমনি ঘাঘরাটা। এক টাকা দি, কেমন?

টাকাটার চকচকে মুখখানি আবার, শেষবার দেখে নিয়ে দোকানির হাতে দিলাম। দোকানি আপত্তি করল না, চুপ ক'রে রইল।

দু'পয়সায় এবার চীনেবাদাম খাওয়া যেতে পারে। কিম্বা বিড়ি।

দোকান থেকে বেরিয়ে এসে একটি ভিক্ষুক দেখে মনে হয়, কত ঘণ্টা ধ'রেই না জানি ও এমনি নিষ্ফল কাকুতি করছে। পয়সা দুটো ওর পেটেই যাক।

এই পুতুলটার মা হবে আহ্লাদি—বেশ হবে। খুকীর নাম কী রাখব?

পথ চিনে চিনে ইস্কুলে যখন এসে পৌঁছি তখনো বাইরে তুলসীতলায় আহ্লাদির-দেওয়া তেলের বাতিটি নেবেনি।

দোরে পা দিতেই সমস্বরে সম্বর্ধনা এল—এই যে পচা। এই তো এসেছে। কোথায় ছিলি এতক্ষণ ?

—এসেছে ?

আর্তনাদ ক'রে মাস্টার তেড়ে বেরিয়ে এল। লণ্ঠন নিয়ে বেরিযে এল আহ্লাদি। পুতুলটা তাড়াতাড়ি কাপড়ের তলায় লুকিয়ে ফেললাম।

অন্ধকার হলেও মাস্টারের মুখ দেখে হৃৎপিণ্ড অসাড় হয়ে গেল। কাউকে পাঠিয়ে মেহেদির ডাল ভেঙে আনাবার ধৈর্য মাস্টাবের ছিল না। ডান পায়ের খড়ম তুলে নিয়ে হাঁকলে—চৌত্রিশ।

সব স'রে দাঁড়াল।

আমার পিঠের হাড় ক'খানা চূর্ণ হযে গেল! চীৎকার ক'রে উঠলাম— আমি পথ হারিয়ে গেছলাম, এত বড় কলকাতা শহর, কত কষ্টে এসেছি, কিছু খাইনি, আমাকে ছেলেধরা ধ'রে নিয়ে গেছল।

মাথায় ছাব্বিশের বাড়িটা পড়তেই মাথাটা দু'হাতে চেপে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। পুতুলটাও আমার সঙ্গে ধূলাশয্যা নিতেই মাস্টারের বাঁ পায়ে খড়মের চাপে—চেঁচিয়ে উঠলাম—আমার পুতুল, আহ্লাদি—খুকী খুকী— অনেক অবান্তর কথা কয়ে ককিয়েছি, ও-কথার অর্থও কেউ বোঝেনি। আহ্লাদি আমার কান্না শুনে কাপড় দিয়ে মুখ ঠাসছে। কিন্তু গলায় যে ওর নটরুর-দেওয়া পুঁতির মালাটা।

সমস্ত বুকে পিঠে ব্যথা, কিন্তু বুকের মধ্যে ব্যথা পুতুলটার জন্য।

চাটায়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। খাওয়া বন্ধ—মাস্টারের হুকুম। নটরুটা বেজায় খুশি; বালিশটা আজো ওর বুকের তলায়।

পা টিপে টিপে যেমন চলা, তেমনি আস্তে আস্তে ঘুম ভেঙে গেল। মাঝরাত, ঝিল্লি ডাকছে। হঠাৎ আহ্লাদির ঘর থেকে আর্ত চীৎকার উঠল—চোর, চোর!

ঘুম ছেড়ে সবাই হল্লা শুরু করেছে। মাস্টার লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল। সবাই আহ্লাদির ঘরে। ভয়ে কেউ একটা লণ্ঠন জ্বালাতে পর্যন্ত পারে না। শেষকালে আমিই জ্বালালাম।

আহ্লাদি তখনো থরথর ক'রে কাঁপছে। মাস্টার বললে—কোথায় চোর? আহ্লাদি বললে—হ্যাঁ, দরজা ঠেলে ভেতরে এসে আমার বিছানার ধারে বসল।

—তারপর?

সবাই চেঁচিয়ে উঠেছে।

—আমার গলাটা টিপে ধ'রে মালাটা ছিঁড়ে ছিনিয়ে নিল।

সত্যি সত্যিই দেখলাম ওর সারা বিছানায় পুঁতিগুলি ঝ'রে পড়েছে—সোনালি পুঁতি।

—তারপর চোর ব'লে চেঁচাতেই দরজা খুলে বাঁশ-ঝোপের আড়াল দিয়ে পালিয়েছে—

—চল চল সবাই চল।

মাস্টারের হুকুমে বাঁশ-ঝোপের আনাচে কানাচে খুঁজতে লাগলাম সবাই, লণ্ঠন নিয়ে।

নটরু বললে—সোনালি পুঁতি কিনা, চোর ভেবেছে বুঝি সোনার হার। বেটা ভারি জব্দ হয়েছে তো।

আহ্লাদি ঠোঁট ফাঁক ক'রে হাসে। বলে—বুক আমার এখনো কাঁপছে ভাই! বেটা কি জোয়ান, সিংহের থাবার মতো হাত, আর একটু হলে গলা টিপেই মারছিল আর কি।
নটরু গলা খাটো ক'রে বললে—তোকে আমি সোনার হার দেব আহ্লাদি। তুই ভাবিস নে।
আহ্লাদি মিথ্যে কথা বলে। চোর কক্ষনো ওর গলা টিপে ধরেনি।

কত দিন পরে মনে নেই, ঘুম ভেঙে মনে হল আহ্লাদির সমস্ত গা আহ্লাদে ভ'রে গেছে। ওর গায়ে একটা ব্লাউজ।
জিগগেস ক'রে ফেলি—কোথায় পেলি রে এ-জামাটা?
আহ্লাদি মুচকে হাসে, কথা যেন বেরোয় না—মাস্টার।
নটরু এসে বলে—কত দাম নিলে রে আহ্লাদি?
এ কি অন্ধ ভিখারীর ভালার আটাশ পয়সা? ঢের ঢের দাম। উমির এক-রত্তি একটা ফ্রক্-এর দাম নিয়েছিল সাড়ে পাঁচটাকা। এমনি তার রঙ। সাড়ে পাঁচটাকা নটরু দেখেছে?
উমি আমার পাঁচ বছরের ছোট মামাতো বোন—ঠোঁটের কিনারে ছোট্ট একটি তিল। মনে পড়ে।
বাতিটায় তেল নেই, বইয়ের আখর ঝাপসা হযে আসছে। বলি—নন্তু, আহ্লাদির কাছ থেকে একটু তেল চেয়ে আনবি? পড়াটা তৈরি ক'রে ফেলি।
—তুই যা না। কেশে কেশে আমার দম আটকে আসছে—আমি উঠতে পারছি না। তুমি কোন নবাব পুত্তুর।

ভুগে ভুগে নন্তর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে।

একটা মোটে বাতি। বাতিটা নিবে গেল।

হারান বললে—আহ্লাদি কি ক'রেই বা তেল দেবে? ওর তো জ্বর।

—জ্বর? কে বললে? বিকেলেও তো পেড়ে পেড়ে কুল খাচ্ছিল।

—তাতে কি? মাস্টার ডাক্তার পর্যন্ত ডাকতে গেছে।

কেষ্ট খুব কম কথা কয়। হঠাৎ ব'লে উঠল—মাস্টারের সব তাতেই বাড়াবাড়ি। জ্বর আসতে না আসতেই ডাক্তার। আর নন্ত আজ পুরো একটা বছর কাশছে।

বাতি নিবতেই নটরু শুয়ে পড়েছিল। মাস্টারের খড়মের আওয়াজ দোরের কাছে আসতেই চেঁচিয়ে উঠল—পচা আলো নিবিয়ে দিয়েছে, পড়া করতে পারছি না।

আমিও চেঁচিয়ে বলি—তোর বালিশের তলায় তো বিড়ি ধরাবার দেশলাই আছে, দে না।

অন্ধকারে তারপর ভীষণ মারামারি শুরু হয়। লাভ হয় না কিছুই। মাস্টার বেত নিয়ে হাঁকে—একুশ।

·

আহ্লাদির জ্বরটা জোরেই এল বলতে হবে।

সাঁঝ সাতটা থেকে ভোর সাতটা পর্যন্ত বারো ঘণ্টা ভাগ ক'রে তিনজন ক'রে ডিউটি পড়ে।

সবার ভাগে চার ঘণ্টা। মাস্টার ঘুমায়। তার ডিউটি দিনের বেলা। ইস্কুল আর বসে না।

ইস্কুলের খাতায় সব শেষে নাম ব'লে ডিউটিও পড়ল সব শেষে। সাতটা

থেকে এগারোটা—ডিউটি পড়ুক আশা করিনি। ঐ টুকুন রাত তো প্রায় রোজই জাগি। এগারোটা থেকে তিনটে—ভারি সুন্দর সময়! বরাতে নেই।

ঘরে ঢুকেই বললাম—ডোবায় নাইবি আর আহ্লাদি?

আহ্লাদি দুটো হাত ধ'রে একেবারে বুকের কাছে টেনে বসিয়ে দেয়।

হঠাৎ শুধোই—তোর মা-কে মনে পড়ে?

আহ্লাদি কি বলেছিল তার তাৎপর্য বুঝিনি। বলেছিল—ওর মা যখন চড়কতলায় খোলার ঘর ভাড়া নিলে তখন ও সাত বছরের। মাস্টারের পয়সায় ওদের দিন চলত। হঠাৎ ওর মা যখন মারা পড়ে, মাস্টার তখন ওর হাত ধ'রে শ্মশান থেকে বরাবর এই আশ্রমে নিয়ে আসে।

বলি—মাস্টার তোর কে হয়?

আহ্লাদি শুধু বলে—মাস্টার।

পাখা করতে করতে আমার হাতে ব্যথা ধরে। ঘুম পায়। কাঁহাতক ঠায় ব'সে থাকা যায় চুপ ক'রে?

—কি রে, ঢুলছিস? ঘুমোবি?

আবার পাখা চলে।

—আয়, ঘুমো।

আহ্লাদি আমার মুখটা একেবারে ওর বুকের উপর চেপে ধরে।

—কতক্ষণ আর! এগারোটা বাজতেই তো মাস্টার চুলের ঝুঁটি ধ'রে তুলে নিয়ে যাবে।

—যাক, এখনো তো এগারোটা হয়নি। ব'লে গুনে গুনে আহ্লাদি আমার গালে ঠোঁটে এগারোটা চুমু দেয়। শব্দগুলি যেন আজো শুনতে পাচ্ছি।

নটরু একেবারে মারমুখো—কোমর কেছে এসে বলে—তুই আহ্লাদিকে চুমু দিয়েছিস ?

প্রশ্ন শুনে তাক লেগে যায়।—দিয়েছি তো দিয়েছি, তোর কি ?

—আমার কি ? ব'লে সাঁ ক'রে গালে এক চড় কসিয়ে দিলে।

কিন্তু যুদ্ধে সেদিন হারলাম না। আহ্লাদির চুমো আমার গায়ের সমস্ত রক্ত পাগল ক'রে দিয়েছে। নটরু কেঁদে ফেলেছে। বললে—মাস্টারকে আমি এখুনি বলতে যাচ্ছি।

—যা না ! এও বলিস আহ্লাদির চুমু না পেলেও পচার পঁচিশটা লাথি পেয়েছিস।

নটরু মাস্টারকে বলে না বটে কিন্তু নন্তুর মাঝরাতের ডিউটি কেড়ে নেয়। বললে—খানিক বাদেই তো তোর ঘড়ঘড় শুরু হবে। তুই যা, বালিশে মাথা গুঁজে উবু হয়ে শুয়ে থাক গে যা। হেঁপোরুগী, ডিউটি দেয় না, যা।

নন্তু আপত্তি করে না। কিন্তু আমার মাথাটা যেন কেমন ক'রে ওঠে।

নটরু দরজা ভেজিয়ে দেয়। আমি দক্ষিণের খোলা জানলার তলায় মাটির দেয়ালে পিঠ রেখে ঘুপটি মেরে ব'সে থাকি।

তেমনিই আহ্লাদি ওকে বুকের মধ্যে মুখ রেখে শুতে বলে। তেমনি একের পর এক ঘনঘন শব্দ হয়।

মাস্টার তখন ছিলিমে ব'সে ঝিমুচ্ছিল। ছুটে গিয়ে বলি—শিগগির আসুন, আহ্লাদির—:

মাস্টার হুঁকো ফেলে দৌড়ে আসে। বলে—কি ?

—জানলা দিয়ে দেখুন।

মাস্টারের সঙ্গে আমিও মুখ বাড়াই। নটরুর মুখটা তখনো আহ্লাদির মুখের উপর। ওর খালি এগারো নয়, ওর বুঝি একশো-এগারো।

যা ভেবেছিলাম, তা কিছুই হয় না কিন্তু। মাস্টার শুধু নটরুর কাঁন ধ'রে আলগোছে তুলে নিয়ে আসে। মাস্টারের পাযে কি আজ খড়ম নেই ?

পবদিন আশ্রমকর্তা এসে নটককে আশ্রম থেকে নির্বাসিত ক'রে দিলে। মাস্টারকে বললে—এতগুলো ছেলের মধ্যে এত বড মেযে রাখা উচিত হবে না। ওকে সরাও।

নটরুব যে একটা প্যাঁটবা ছিল, জানতাম না। যাবার বেলায সেটা খুলল দেখলাম। নানান জিনিসে ভরা—লাট্টু, গুলি, আযনা, চিরুনি, এমন কি আহ্লাদির ভাঙা কাঁচের চুড়ি পযন্ত।

বলি—কোথায় যাবি এবার ?

—কোথায় আবার! পথে।

প্যাঁটরাটা গুছোতে গুছোতে হঠাৎ থেমে বলে—এটা ঘাড়ে ক'রে কোথায় বা নিয়ে যাব ? এটা থাক। আহ্লাদি ভালো হলে এটা আহ্লাদিকে দিয়ে দিস। ওর ব্লাউজ কাপড রাখবে। দিবি তো পচা ?—ব'লে আমার হাত ধরে। প্রথম দিনও ও আমার হাত ধরেছিল।

আমার চোখ ছলছল ক'বে ওঠে।

নটরু বললে—আমার কিন্তু একাই বেরুবার কথা নয়। তুই মাস্টারকে কেন বলতে গেলি ? আমার মতো ডিউটি বদলে নিলেই তো পারতিস।

মাস্টার এসে হুকুম দেয়—পৌনে ছ'টার আগেই আশ্রম ছাড়তে হবে।

সবারই কাছ থেকে বিদায় নিতে নিতে দেরি হয়ে যায়। মাস্টার পিছন থেকে ছুটে এসে নটরুর পিঠে সপাং ক'রে একটা বেত আছড়ে বলে—দু' মিনিট দেরি হয়ে গেছে, দু'মিনিটে আঠেরো।
কেষ্ট রেগে বলে—দেখি কেমন দু'মিনিট বেশি হয়েছে। বার করুন ঘড়ি—
আবার বেত পড়তেই নটরু 'মাগো' ব'লে ছুটে পথে বেরিয়ে গেল। বাকি বেতগুলি এবার নিশ্চয়ই কেষ্টর পিঠে পড়বে।

ডাক্তারের বাড়ি থেকে মাস্টার খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এল।
মাস্টার নটরুকে পুলিশে দেবে প্রতিজ্ঞা করলে। পথের পাশে অন্ধকারে গা ঢেকে মাস্টারের পায়ে বাঁশ চালিয়েছে।
ঘরে এসে বলি—বেশ হয়েছে। পা দুটো গুঁড়িয়ে গেল না রে।
বালিশ থেকে মুখ তুলে নন্তু উবু শরীরটা একটু দুলিয়ে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলে—মাথাতেই তাক ক'রে মারতে গেছলাম, কিন্তু ফসকে গিয়ে লাগল মাস্টারের পায়ে। ভয় করছিল বুকের সাঁই সাঁই আওয়াজ পেয়ে চিনে ফেলে। বেটা এমন চোঁচা ছুটলে ভাই, শেষে হোঁচট খেয়ে প'ড়ে গেল।
আজ সমস্ত রাত নন্তুর পাশে ব'সে ওর বুকে হাত বুলিয়ে দেব। আহ্লাদির ডিউটি মাস্টার দিক গে।

আহ্লাদিকে কিন্তু মাস্টার সরাল না। ডোবার ধারে ছোট্ট একটি ঘরে আহ্লাদির কোয়ার্টার হল—বেড়া দিয়ে চারধার ঘেরা। হুকুম হল—যে ছেলে ঐ ধারে যাবে তার শাস্তি নির্বাসন।

তারপর—ভাবতে অবাক লাগে—দু'বছর কেটে গেল, তিন বছরো প্রায় ভ'রে এল—আহ্লাদিকে দেখি না। ঐ বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট বাড়িটি ভোরের শুকতারার মতো দূর আর সুন্দর মনে হয়।

ঐ বাড়িতে কখন মিটমিট ক'রে বাতি জ্বলে, কখন নিবে যায়, সব চেনা হয়ে গেছে। বেড়ার ঢাকনি দেওয়া ঘাটে ব'সে গা ধুলে কখন ডোবার নীলচে জল চঞ্চল হয়ে ওঠে, জানি। ঘুড়ি ওড়াবার সময় ইচ্ছে ক'রে ওর উঠোনে ঘুড়ি গোঁত মেরে ফেলে দিই, ও ঘুড়ি ছিঁড়ে রাখে—নীল সবজে বেগনী। তাতে লেখা থাকে আহ্লাদি, আহ্লাদি, আহ্লাদি!

আমি এখন সকল ছেলের পাণ্ডা—ইস্কুলে, সাঁতারে, খেজুর গাছে, মাটি চষায়, তামাকে আর বিড়িতে। দুপুরের ইস্কুল ছুটি হতেই মাস্টার আমাকে বললে—তিনদিনের জন্য তোকে আশ্রমের ভার দিয়ে যেতে চাই, পারবি? তুই তো এখন বেশ ওস্তাদ হয়েছিস।

—খুব পারব। আপনি কোথায় যাবেন?

—আমি আজ সন্ধ্যার গাড়িতে আহ্লাদিকে নিয়ে দেশে যাব। ওকে আর এখানে রাখব না, ওর পিশির কাছেই থাকবে।

আহ্লাদির আবার পিশি কে? এতদিন কোথায় ছিল? চুলোয়?

যাবার বেলায় আহ্লাদিকে একবার দেখতে পাই না? সন্ধ্যা উৎরে গেল। গাড়ি নিশ্চয়ই কত বন নদী পেরিয়ে ছুটেছে। আহ্লাদি ঘুমিয়ে পড়েছে হয়তো। যদি যাবার আগে দূর থেকে বেড়ার ফাঁকে একটুখানির জন্যও ওর চোখ দুটি রাখত!

চেয়ে দেখি বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাতি দেখা যাচ্ছে। যাবার বেলায় আহ্লাদি তার বাতির স্মৃতিচিহ্নটি আমাদের জন্য রেখে গেছে। বাতিটা যদি বেড়ায় লেগে একটা ভীষণ অগ্নিকাণ্ড হয়ে সমস্ত আশ্রম পুড়ে যায়, বেশ হয়।

বারো বছরের ছেলের চোখে ঘুম আসে না। শেয়াল ডাকে, ঝরা পাতার উপর দিয়ে সাপ হেঁটে যায়, ন্যাড়া খেজুর গাছ অন্ধকারে প্রকাণ্ড ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে—বারো বছরের ছেলের ভয় নেই, ডোবার ধারে পায়চারি ক'রে বেড়ায়।

হঠাৎ একটা চীৎকার শুনতে পেলাম। তিন বছর পর হলেও আহ্লাদির কান্না চিনতে দেরি হল না। তবে কি আহ্লাদিরা যায়নি? ঘুমের মধ্যে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠেছে?

ছুটে মাস্টারকে জাগাতে গেলাম। কেউ নেই। দেয়ালের কোণে হুঁকোটি পর্যন্ত নেই। তার মানে?

—কেষ্ট, কেষ্ট, কে কাঁদছে শুনতে পাচ্ছিস? আহ্লাদি?

—আহ্লাদি? আহ্লাদি?

ঘুম ভেঙে সব উঠে দাঁড়াল আতঙ্কে! নন্ত পর্যন্ত।—কোথায়?

আমরা সব সজ্জিত হয়ে নিলাম। বাঁশের লাঠি, দরজার খিল, ভাঙা ছাতা, লোহার ডাণ্ডা, পকেট ভ'রে ঢিল ছুরি দেশলাই নিয়ে এগোলাম। বললাম—আস্তে আস্তে আয়, হল্লা করিস নে, হৈ চৈ করলেই চোর পালিয়ে যাবে কিন্তু।

বসন্ত বললে—আজ নটরু থাকলে কোনো ভাবনা ছিল না।

বললাম—তোরা চারপাশ ঘিরে থাকবি, আমি লোহার ডাণ্ডাটা নিয়ে সটান ঢুকে যাব ঘরে। চেঁচালেই সব হুড়মুড় ক'রে এসে পড়বি।

কান্নার বিরাম নেই, বাতাস চিরছে।

—আর যদি ভূত হয় আমাদের এতগুলোর চেঁচামেচিতে পাত্তাড়ি গুটোবে। রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি?

সবাই বেড়ার চারধারে বিমর্ষ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নটরুর চেয়ে আমি যে

কিছুই কম নই দেখাবার জন্য লোহার ডাণ্ডা নিয়ে সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম।

বসন্ত বললে—জোরসে চেঁচাস কিন্তু। আমরা সব হুড়মুড় ক'রে পড়ব।

বাতিটা উস্‌কে দিয়ে দেখলাম, আহ্লাদি মাটির উপর লুটিয়ে প'ড়ে গোঙাচ্ছে; ভালো ক'রে চেয়ে দেখি, ওর পায়ের কাছে একটা মেয়ে; মরা। মাটি রক্তে ভেজা—

আহ্লাদির গা ঠেলা দিয়ে ডাকি—আহ্লাদি! আহ্লাদি!—

ওর গা ঠাণ্ডা!

চীৎকার শুনে বাইরে থেকে সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—মার, মার, মাথা ফাটিয়ে দে—

খোলা দরজা দিয়ে সবাই হুড়মুড় ক'রে তেড়ে এসে পড়েছে। দু'হাতে ওদের ঠেলে দিয়ে বলি—স'রে দাঁড়া।

ওরা সব স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থাকে। কারো মুখে রা নেই।

আমার পুতুল মাস্টার খড়মের চাপে চেপটে দিয়েছিল, নিজের পুতুল সে নিজেই ভাঙল।

বাতি নিবে যায়।

পথে বেরিয়ে আসি—অনাথ। হঠাৎ সমস্ত শাসন যেন শিথিল হয়ে গেছে।

নৌকার যেন আর নোঙর নেই—ভেসেছে এবার।

তরিতরকারির বাজার। একজনকে বলি—মুটে লাগবে!

—কত নিবি? মোড়ের ঐ যে দোকান চুল ছাঁটবার—

—যা দেন—

মুন্সি আমাকে ওর দোকানে নিয়ে আসে। বলে—কোথায় থাকিস? কে আছে তোর?

—এখন থেকে কোথায় থাকব জানি না। নেই কেউ।

—কি নাম তোর?

—কাঁচা, কাঞ্চন।

—আচ্ছা, এখেনে থাকবি? শুধু খোরাকি আর আস্তানা।

উৎফুল্ল হয়ে উঠি—হ্যাঁ—

মুন্সি বললে—কিন্তু নাম বদলাতে হবে, ভোল বিলকুল ফেরাতে হবে, কেউ যখন নেই, ভাবনা কি?

ভয় পেলেও মুখে বলি—তাই সই।

আসমানি

মুন্সি ডাকে—এ মকবুল।

বললে—কিচ্ছু ভাবিস নে তু। পথে পথে তো ঘুত্তিস, এবাবে একটা হিল্লে হয়ে গেল।

তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস ক'বে বললে—আমার ভাজির সাথে তুব সাদি দেব।

একটি ভদ্রলোক এসে ঢুকল।

—মক্‌বুল।

চেয়াব এগিয়ে দি, কাঁচি ক্ষুব ক্লিপ পাউডারের বাটি গুছোই, ভদ্রলোকের গাযে একটা শাদা কাপড জডাই, হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করি।

ভদ্রলোক তাব মোটা চশমাটা তাকেব উপর ফেলে রাখে, মুখের আধা সিগরেটটা রাস্তায় ছুঁডে মারে, গ্যাঁট হয়ে পা মেলে মুন্সিকে বললে—ধারগুলি সব প্লেন।

পাখা করতে করতে এক ফাঁকে আজিজ মিঞার পাশে ব'সে ওর বিডিটায় একটা টান দিয়ে শুধোলাম—মুন্সির ভাজির নাম জানিস?

আজিজ ফট ক'বে ব'লে বসল—আমিনা। খাসা।

নামটা যেন ওব জিভের ডগায়।

বললাম—বয়েস ?

আজিজ কালো দাঁতগুলি বার ক'রে ফেললে। বললে—তেত্রিশ।

মুন্সি আবার ডাকে—মক্‌বুল !

ভদ্রলোকের ঘাড়ের উপর বুরুশ ঘষি, কাপড়টা চট ক'রে সরিয়ে পিছনের দিকে কাত ক'রে আয়না ধরি।

ভদ্রলোক বললে—বেশ।

মাথায় জল ঢেলে মাথা টিপে দি।

ভদ্রলোক বললে—আর একটু।

আমার হাত দু'টো টেনে এনে চোখের উপর রাখে, আঙুলগুলি বাবুর চোখের পাতার উপর বুলিয়ে দি। মুন্সিকে দাম চুকিয়ে চশমাটা এঁটে পকেট থেকে সিগরেট বার ক'রে ধরিয়ে পথে নামবার আগে আমার হাতটা টেনে মুঠোর মধ্যে কি একটা গুঁজে দিল।

আজিজ হাঁ হয়ে গেছে। বললে—মুন্সি আধঘণ্টা ক্লিপ ঘ'ষে যা পেল না, দু'মিনিট বুরুশ ঘ'ষে তুই তার দুনো কামালি। লে, বিড়ি আনি গে।

—ইস ?

করকরে আধুলিটা ট্যাঁকে গুঁজে রাখি।

আমি কিন্তু আমিনার বয়স এগারোর বেশি ব'লে কিছুতেই ভাবতে পারি না। ওর পরনে নিশ্চয়ই ঘাঘরা নেই, কলমিফুলি শাড়ি। দু'টি হাতের তালু মেহেদির পাতায় রাঙা ; ওদের বাড়ির উঠোনের ধারে নিশ্চয়ই পানায় ভরা পুকুর, নীলচে জল, দুটো হাঁস পাঁক খোঁড়ে। পুকুরের পারে পেয়ারা গাছ, কচি পাতার তলায় তলায় কড়া পেয়ারা।

ভদ্রলোক দু'দিন অন্তর আসে—পকেটে ক্ষুর সাবান স্ট্রপ নিয়ে। বলে—দাড়িটা কামিয়ে দাও মক্‌বুল মিঞা।

দাড়ি কামিয়ে ড্রেস করি, তেমনি ক'রে চোখের পাতায় আঙুল বুলোই। অনেকক্ষণ। মুন্সির দোকানের প্যাটরাব ফাঁকে দু'আনি পড়ে, আমাব গাঁটে ঢোকে দুনো।

সেদিন আজিজ মিঞা এগিযে গেল। ভদ্রলোক বললে—তুই-ই আয মকবুল।

আজিজ বললে—ওব গা-টা ম্যাজম্যাজ কবছে।

—দাড়ি কামানো যায না? তাতে কি বে?

অল্প একটু হাসলাম। আজিজ ক্ষুব-টুর ছডিযে বেখে মুখ ভার ক'রে বেঞ্চিটার উপব বসল।

আজিজকে গিযে বললাম—আজকের আধলিটা তুই-ই নে।

আমার হাতটা ও ছুঁড়ে দিল, বললে—তোব রোজগার আমি নিতে যাব কেন?

পরে কি একটা কথা বিডবিড ক'বে বললে—স্পষ্ট বোঝা গেল না।

সেদিন ভদ্রলোকেব আসবাব সময়-সময বেরিয়ে পডলাম।

আজকে আজিজই দাড়ি চাঁছুক। ঘণ্টা খানেক টহলদাবি ক'রে ফিরে এসে শুধোই—বাবু এসেছিল রে আজিজ?

আজিজের গাল দুটো গুম হযে আছে। বললে—তোকে খোঁজ করলে—

—কামাল না? কত দিলে তোকে?

—প্রায় দশ মিনিট ধ'বে ড্রেস কবলাম—শালা একটা পয়সাও দিযে গেল না।

—মুখ খাবাপ কবিসনে আজিজ, খবরদার।

—মাববি না কি?

এক হাতে লুঙ্গিব খানিকটা তুলে ধ'রে ও তেড়ে এল।

মুন্সি মাঝখানে এসে পড়ল। ওকে ঠেসে ধমকালে, আমাকে টুঁও বললে না।

ও বিড় বিড় ক'রে বললে—কোন শালা এমনি ক'রে—

দোকান ছেড়ে চ'লে গেল। মুন্সি বললে—হোটেলে খেতে গেল।

বললাম—আমার সাত পয়সা ?

মুন্সি হাসল, বললে—তুই তো কত কামাচ্ছিস—

—বা, ও তো আমার উপরি পাওনা। আমার বরাদ্দ খাবার পয়সা আমি ছাড়ব কেন ?

—আচ্ছা, এই নে। উপরি পাওনা দিয়ে কি করবি ?

চট্ ক'রে মুখে আসে না। কিন্তু মনে মনে দেখি আমার সব সিকি আধুলি সোনার ফুল হয়ে গেছে ; পুঁতির মালা নয়—আমিনার গলায় পুষ্পহার।

আজিজ গামছা ফেলে গেছল। বললাম—খাওয়া হয়ে গেল ?

আমার কথায় রা করলে না।

—আর জন্মে ঠোঁটের কাছের আঁচিলগুলি সব চেঁছে রঙটা আর একটু মেজে আসতে পারিস, এ-দিক ও-দিক দু'চার পয়সা ট্যাঁকে গুঁজতেও পাবি আর আমিনাও কপালে লাগ লাগ লেগে যেতে পারে। এ জন্মে—

আজিজ নিজে কথা কয় না বটে, কিন্তু ওর পাঁচটা আঙুল একসঙ্গে কথা কয় আমার পাঁজরার উপর।

খিলখিল ক'রে হেসে উঠি। তার কারণ আছে—আজিজ মিঞার ঘুষির ওজন বিরিশি সিকে।

মাথায় গামছা বেঁধে বেরুতে যাচ্ছি, মুন্সি বললে—আগাম হপ্তায় দরগায় যেতে হবে রে মকবুল। মোল্লা ব'লে পাঠিয়েছে। সেইদিনই কল্‌মা পড়তে হবে রে।

গা-টা ছমছমায়।

দরগায় যেতে হল না কিন্তু। সেদিন ভদ্রলোক ক্ষুর সাবান নিয়ে এসে নিশ্চয়ই ঘুরে চ'লে গেছে।

দোকানের ঝাঁপ পড়েছে।

টালিগঞ্জে মুন্সির বাড়ি। রোদে টো টো—লুঙ্গি ফট্‌ফট্ করতে করতে এক হাঁটু ধুলো নিয়ে মাটির ঘরের ভাঙা কবাটের কড়া নাড়ি।

মুচি-পটির এঁদো রোগা গলিটা চামড়ার গন্ধে সম্‌সম্ করছে।

দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে কে খুললে। ভাবলাম এই বুঝি তার মেহেদি-পাতায় রাঙা হাতের তালু—ছোট ছোট নখের ধাবে আবছা হয়ে এসেছে। সমস্ত হাত পা ঝিঁ ঝিঁ ক'রে উঠল।

মুন্সি বেরিয়ে এসে বললে—কে, মক্‌বুল ?

বললাম—আমার প্যাট্‌রাটা মুন্সি—

—হ্যাঁ, কি হবে প্যাট্‌রা দিয়ে ?

—নিয়ে যাব।

—তু ক্ষেপেছিস মকবুল মিঞা! প্যাটবাটা মাথায় ক'রে সারা শহব ঢুঁড়বি নাকি ? যদি কোথাও জিরোবার জায়গা পাস, নিয়ে যাবি। এখন থাক না হেতা!

—কোথা আছে ওটা ?

—আমিনার ঘরে। খোলবার কিছু দরকার আছে ?

একটা প্যাচপেচে ঘরে মুন্সি আমাকে নিয়ে এল। চট ক'রে চারদিক একবার চেয়ে নিলাম। একটা তক্তাপোশের উপর চিটচিটে বিছানায় গুটি কয়েক বেড়ালের বাচ্ছা চোখ মিটমিট করছে। এটাকে আমিনার ঘর

ভাববার কোনো জো নেই কিন্তু। পাতলা তক্তাপোশের নিচে একজোড়া মেয়েলি চটি; কিন্তু আমিনার বয়স কি এগারো নয়?

মুন্সি বললে—তোর ওপর ভাজির কিন্তু ভারি টান পড়েছে রে মক্‌বুল। একদিন আমাকে না ব'লে ক'য়ে প্যাটরা থেকে তোর বইগুলি খুলে সে কী মনোযোগে পড়া। যেন বুকে আঁকড়াতে চায়।

আমার বুকটা চিতোয়। বললাম—পড়তে জানে নাকি ও?

—জানে না আবার! রাতদিন তো বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকে—

ভারি খুশি লাগল।—ওর ভালো লাগলে আমার বইগুলি যেন ও রেখে দেয়।

মুন্সি আহ্লাদে ডেকে উঠল—আমিনা! আমিনা!

ভাবলাম, এই বুঝি ওর ছুটে আসার পায়ের ছোঁয়ায় সমস্ত ঘরটার অদলবদল হয়ে যাবে। কিন্তু আমিনার সাড়া নেই। মুন্সি বললে—বেটির ভারি সরম।

প্যাটরাটা খুলে দেখি, কে যেন সব ঘেঁটেছে। আমিনার হাতের ছোঁয়া কি ঘাঁটা পুঁথি-খাতার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে?

গেঞ্জির ও-পিঠে একটা ছিটের তালি লাগিয়ে পকেট করেছিলাম; তার থেকে পাঁচটা টাকা বার ক'রে বললাম—এই টাকা ক'টা প্যাটরায় এই টিনের কৌটোর ভেতরে রাখি মুন্সি। আজিজ মিঞার আস্তানার ছোঁড়াগুলি সুবিধের নয়।

মুন্সি ঘাড় কাত ক'রে তাড়াতাড়ি বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ভালো। আজিজেরা তো গাঁটকাট। এখানেই থাক। তোর ভাবনা নেই মক্‌বুল।

—তালা নেই কি না, আমিনা যেন একটু চোখ রাখে। ওর ঘরেই যখন রইল।

—তোর জিনিসের ওপর বেটির ভারি চোখা চোখ।
—আর যদি ওর খুব দরকাব হয় এক আধ আনা খবচও যেন করে।
আমিনা জেনে নিশ্চযই গর্ব বোধ করবে যে তার তুল্‌হা ফকির নয়।
মুন্সি ফের আহ্লাদে ডেকে উঠল—আমিনা। আমিনা।
আমিনাব সরমেব মাত্রাটা একটু বেশি বলতে হবে।
যাবার আগে মুন্সি বললে—দবগায কবে যাবি রে মক্‌বুল? ভাজি তো দিনেব পর দিন ডাগব হতে চলল।
—কামাতে পাবি না এক পয়সা, সাদি কি মানায মুন্সি?
—কি যে বলিস। মোছলমানটা হয়ে নে, তোকে আমি ডিপটি ক'বে ছাডব। অঙ্কে তোব এমন মাথা। মোল্লা কালও লোক পাঠিযেছিল বে।
—আচ্ছা, এ-হপ্তাটাও যাক। একটা হিল্লে ক'রে নি।
মুন্সি কিছু বলবাব আগেই পথে নেমে পডলাম। নিজেকে আব একটুও ঢিলে লাগে না। সাঁ সাঁ ক'রে চলি। গেঞ্জিব পকেটে এখনো ন'সিকে—একটা দোকানে গিয়ে বালিব কাগজ আর পেনসিল কিনি।
আস্তানায খালি খালি বিডি পাকাতে ভালো লাগে না। ছোঁড়াগুলোর সঙ্গে পচা ইযার্কি দিই, ছপ্পুর সাত বাবেব বার নিকে করা ছুঁডি-বৌটাকে নিয়ে ওবা গান বানায়, আমিও সুব ভাঁজি। তারপব রাত অনেক হয়ে গেলে বাডি ঘর দোর আঁধিয়ার আকাশ—সব যেন কেমন ক'রে ওঠে। ঘুম আসে না। কুপিটা জ্বালিযে পেনসিল দিয়ে হিজিবিজি আঁচড কাটি, কি যেন ব'লে বোঝাতে চাই, পারি না।
কুপিব ছিপিটা খুলে খানিকটা কেরোসিন আজিজ মিঞার নাকের মধ্যে ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে। ওব নাকের কল বিগডেছে।

ভাদ্রের গঙ্গা—শান দেওয়া ছুরির মতো ধার!

শান বাঁধানো পিছল ঘাটের সব শেষের সিঁড়িটায় ব'সে জলে পা ডুবিয়ে চেয়ে থাকি। ইচ্ছে করে ঢেউয়ের মধ্যে দিয়ে সাঁ ক'রে ছুটে যাই ফেরি বোটের চাকার মতো! ঐ বাঘা জাহাজটার চোঙার আওয়াজের মতো জলের হুসহুস করি!

বাঁধানো ঘাটে উড়ে বামুনের দল কেরোসিনের বাক্স সাজিয়ে চন্দনের বাটি নিয়ে বসেছে। সমুখে দলে দলে মেয়ের ভিড়—কারু মাথায় ঘোমটা, কারু বা পিঠের উপর চুল মেলা। উড়ে আমার লুঙ্গি দেখে কিড়মিড় ক'রে উঠল। মেয়েরা একটু স'রে বসল, কেউ বা একটু তাকাল, বা তাকাল না।

বললাম—ঘণ্টাখানেক বাদে লুঙ্গিটা ছেড়ে গলায় একগাছা ধোলাই পৈতে ঝুলিয়ে এলেই এগোতে দেবে তো বামুন ঠাকুর?

একটি মেয়ে খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

পরের দিন গলায় শুধু পৈতে নয়—একেবারে বাক্স জল-চৌকি কোশাকুশি ধূপ চন্দনের বাটি নিয়ে বাঁধানো ঘাটের ধারে অশ্বত্থ গাছের তলায় এসে বসলাম। আজিজ মিঞাকে রোজগারের থেকে কিছু বকৃশিস দিতে হবে। বেচারা মাথায় ক'রে জিনিসগুলি পৌঁছে দিয়েছে কিন্তু।

উড়ের ঘুম তা হলে খুব ভোরে ভাঙে না। বামুন যখন ঢিকোতে ঢিকোতে আসে নদীর জলে রোদ তখন চটচট করছে। আমাকে দেখে তেড়ে এল, বলে কি না, মোছলমান!

হেসে বললাম—আড়াই হাত গামছা যেমন তোদের, তেমনি ডোরাকাটা লুঙ্গি হাল-বাবুদের ফ্যাশান।

মেয়েদের বললে—ও আস্ত মোছলমানের বাচ্চা, ওর থেকে ফোঁটা নেবেন না।

—না মা, আমি খাঁটি বামুনের ছেলে, কোন্নগরের চাটুজ্জে আমরা—অবস্থার দোষে—

আরো বললাম—ও ব্যাটা ভারি পাজি, মিথ্যেমিথ্যি যা তা বলে। পরনে লুঙ্গি থাকলেই যদি মোছলমান, তবে সমস্ত বর্মা দেশটাই পীরের মুলুক।

বুড়ি মেয়েমানুষটি বললে—না বাবা, কাত্তিকের মতো মুখ, এক্কেবারে আমার ছেনাথের মতো! ওলাবিবি ছেনাথকে গেরাস করলে বাবা, বাছা আমার কাটা পাঁঠার মতো—

বুড়ি হাপুস কাঁদছে। শ্রীনাথ কবে বঁড়শিতে বেলে-মাছ ধরেছিল, কবে চিনি চুরি ক'রে খেতে গিয়ে নুন খেয়ে ফেলেছিল, বুড়ি সে-কথা উল্লেখ করতেও ভুললে না।

চোখের জল মুছে ফেলতেও দেরি হল না কিন্তু। বললে—ভালো ক'রে ললাটে চন্দন চর্চিত ক'রে দাও তো কাত্তিক। রোদ চড়া হতেই মাথার রগ দুটো দপদপ করতে শুরু করে। বেশ ক'রে লেপে দাও তো ছেলে!

থুতনিটা ধ'রে আদর করতে চায়। কিন্তু পয়সা দেবার বেলায় সেই একটাই।

রোজগেরে সাড়ে চারআনা পয়সা উড়ে বামুনের হাতে দিয়ে বললাম—একটুখানি ঠাঁই ক'রে নিতে দাও বামুনঠাকুর। তোমার ব্যবসার ক্ষেতি হবে না।

পয়সা পেয়ে উড়েটা হাসে।

ভারিক্কি কছমের মেয়েরা বললে—এ চুনোপুঁটি বামুনঠাকুরটি আবার কোত্থেকে জুটল? ছেলেবয়েস থেকেই মন্দ ব্যবসা ফাঁদে নি।

উড়ে বললে—সাক্ষাৎ গণেশঠাকুর মাঁ। গোটা মহাভারতটা কণ্ঠস্থ। ওর হাতের ফোঁটা বিষ্টুর চন্নামৃতেরই তুল্য।

এক ফাঁকে বললে—সংস্কৃত শ্লোকটা মুখস্থ ক'রে ফ্যাল্। দুটো লাইন আওড়ায়—অনুস্বার বিসর্গে ভরতি। বার কতক শুনে কোনো রকমে নকল ক'রে কড়মড করি। ও বললে—এতেই হবে।

ওর কাছে মা, আমার কাছে মেয়ে।

বাঁ হাত দিয়ে চিবুকটা লেপটে ধরি, ডান হাত দিয়ে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা কাটি। অশ্বথের কচি পাতাব মতো মুখ বাতাসে তুলতুল করছে। দুটি ফুরফুরে ঠোঁট ফুঁযেই যেন উড়ে যাবে।

বললাম—তোমার নাম কি?

লজ্জায় চোখের পাতা দুটি নামায—কথা কয় না।

—কোথায় থাক?

এবারো না।

—গঙ্গায় নাইতে তোমার খুব ভালো লাগে?

ঘাড় কাত ক'রে চুলবুল ক'রে একটু হাসে। রা কাড়ে না, সরম খালি একলা আমিনাবিবিরই নয়!

বললাম—পড়তে জান?

এবার মেয়েটির ঘাড় অনেকখানি হেলে। আওয়াজও একটু বেরোয়—হ্যাঁ।

—বাড়ি গিয়ে আয়না দিয়ে মুখ দেখো, কেমন?

আবার ঘাড বাঁকায়।

ওর কপালে চন্দন দিয়ে উলটো ক'রে লিখে দিয়েছি—কালকে আবার এসো।

কিন্তু কালকে আর মেয়েটি আসে না।

ছপ্পুর বউ হাতছানি দিয়ে ডাকে।

আজিজ বললে—আমাকেই। ব'লে বিড়িব কুলোটা ফেলে হনহন ক'রে ছুটে গেল। মাঝের ডাস্টবিনটা এক লাফেই ডিঙিয়ে ফেললে। কিন্তু জানলা বন্ধ হয়ে গেল যে। আজিজ শিস দিতে দিতে ফিরে এসে জিভটা ভারী ক'রে বললে—বেটি ভারি লাজুক তো।

খানিক বাদে আবার জানলা খোলে—আবার হাতছানি।

হামিদ উঠে পড়ল এবার। ছপ্পুর বউ দুই হাত দিয়ে না ক'রে উঠল। তবু হামিদ তেড়ে গেল দেখে জানলা দুটো বন্ধ ক'রে দিলে। হামিদ মাঝ পথ থেকে ফিরে এল।

তেমনি আবার আঙুল নেড়ে নেড়ে ডাকা।

এবার আমি উঠলাম— শেষবার। জানলা বন্ধ হল না। বন্ধ তো হলই না, জানলার ফাঁকে ডিবেটা জ্বালিয়ে ধরল। আমাকে পথ দেখায়।

সবাসব দাওয়ায় উঠে এলাম। ভিতর থেকে ডাক এল—ঘরে আয় মকবুল।

ছপ্পুর বউ নাম জানে তা হলে।

মাথাটা চনচন ক'রে উঠল। বললে—ছপ্পু গেছে কামারপোলে কোন বিয়ে বাড়ির ছাপ্পর তুলতে, রাত ক'রে ফিরতে পারনি। তোর আজ এখানে শুতে হবে।

ও আরো পরিষ্কার ক'রে বললে—রহমৎ দারোগার চাউনি ভারি তেরছা,

মক্‌বুল। তা ছাড়া ঐ আজিজ হারামজাদা, আমাকে একলা পেয়ে যদি ব্যাটারা আজ দরজা ধাক্কায় ?

বললাম—আর আমিই কি ওদের লাঠি ঠেকাতে পারব ?

—তবু তুই একটা ভর, মকবুল।

—আমার পাঁকাটির মতো হাত ওদের ক'টা ঘুষির সঙ্গে লড়বে ? একটা জোয়ান লোককে পাহারা দিতে ডাকলেই ভালো হত।

—তা হলে রহমৎকেই ডাকব নাকি রে ? ব'লে কি রকম ক'রে জানি হাসে। হাসিটাও নিশ্চয়ই সিধে নয়, তেরছা।

রাত তখন পেকে এসেছে। বিবি বললে—খাবি ? গোস্ত ছিল টাটকা।

বললাম—না। ঘুম পাচ্ছে বেজায়।

উঁচু তক্তাপোশটায় বিবি বিছানা ক'রে দিলে। বললে—শো।

—আর তুই ?

মাটির উপর মাদুর বিছিয়ে বললে—হেতা, মাটিতে।

—দোরটা ভালো ক'রে এঁটেছিস তো বিবি ? দেখিস।

বিবি ডিবেটা নিবিয়ে দিলে। বললে—হ্যাঁ রে হ্যাঁ! আমার চেয়ে যে তোর বেশি ভয়!

আজিজ মিঞা কি ভাবছে ? এখনো বিড়ি পাকাচ্ছে বুঝি।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বিবি ডাকল—মক্‌বুল।

বিবির বুঝি ঘুম আসছে না। বললাম—মাটিতে শুলে ব্যায়রাম হবে বিবি, খাটে উঠে আয়!

বিবি কিৎকিৎ ক'রে হাসে ; বললে—তোর পাশে ?

—কেন, আমি তো আর রহমৎ নই।

বিবির মাটিতে শুয়েই ঘুম আসে কিন্তু।

অনেক রাতে সত্যিসত্যিই কে দরজা ধাক্কায়।

বিবি চেঁচিয়ে উঠে আমাকে জাপটে ধরলে, বললে—রহমৎ দারোগা এল বুঝি। কি হবে মকবুল?

আমাদের হল্লা যতই চড়ে, ধাক্কা ততই বেথাপ্পা হয়।

দরজাটা ভেঙে ফেলেছে। ধুপ ক'রে মাটিতে নেমে দেশলাইটা জ্বালিয়ে দেখি—রহমৎ নয়, আজিজ মিঞা। পিছনে হামিদ আর আলি।

ওরা যার জন্য গান তৈরি ক'রে এতদিন সুরের কসরত করল তার দিকে একটিবার ফিরেও চাইল না। আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমারই জন্য যেন ওরা ওৎ পেতে ছিল—এমনি।

আমার চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঝাঁকি দিতে দিতে আজিজ বললে—এত রাত হয়ে গেল, আস্তানায় ফিরবার নাম নেই।

হামিদ লাথি মেরে বললে—পরের বাড়ি আসনাই?

ওরা আমার অভিভাবক—শাসন করছে।

রহমৎকে না দেখে বিবির বোধ হয় মন ওঠেনি। আর চেচামেচি নেই—প্রতিবাদ নেই, কড়ে আঙুলটিও তুলল না। আস্তে আস্তে ডিবেটা জ্বালিয়ে দোরের পাশে রাখল।

ওরা আমাকে ঠেলে পথের কাদায় ফেলে দিলে। বিবির আর ভয় নেই। এবার ওর তিনজনই রক্ষক। রহমৎ আর ডরে আসবে না।

বাকি রাত আস্তানায় নয়, কাটাই ফুটপাতের উপর। ময়লা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে পথ চলা শুরু হয়। সকাল থেকে দুপুর—দুপুর থেকে রাতের

তারার চোখ চাওয়া তক। খালি রাস্তার জলেব কল টিপে টিপে পথ ভাঙা।
যেখানটায় ভির্মি দিয়ে পডলাম চোখ চেযে দেখি বাডিটাব গাযে লেখা—মহেশ্বরী ইটিং হাউস।
লুঙ্গি পরনে থাকলে কি হবে, গেঞ্জির তলায় পৈতে দেখে সবাই আশ্বস্ত হল। কর্তা বললে—সারাদিন কিছু খাসনি? এই বিশে, একটা রুটি এনে দে তো।
কর্তা বললে—বাডি কোথা?
রুটি খেতে খেতে একটা দুঃখের কথা বানিয়ে বললাম। বললাম—এখানে একটা কাজ দিন।
—বেশ, থাক, চায়েব কাপ টেবিল সাফ কববি, থেকে যা।
মাইনেব কথা কিছুই বলে না।
বিশে বললে—কি নাম তোর?
একটুখানি ভেবে নিতে হল। বললাম—কাঁচা।
বিশেটা হাসে। বললে—ঐ বাবুরা এসেছে। টেবিল পুঁছে দে গে যা।

আবার টালিগঞ্জেব পথে।
কডা নাডতে হয় না, দরজা খোলাই আছে, আমিনার ঘবও খোলা, বিছানাপত্র কিছুই নেই কিন্তু। ডাকি—মুন্সি। সাডা পাই না। ডাকি—আমিনা!—আমিনার যে সরম।
আমার প্যাটরাটা এক কোণে প'ডে আছে বটে। খোলা সেটাও। হাটকাই, টিনের কৌটোটা নাডি চাডি কিন্তু ভিতর থেকে কিছুই বাজে না।

মুন্সি যে বলেছিল আমিনা দিনরাত্রি বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকে তার কিছুই প্রমাণ পাওয়া গেল না। শেষকালে বইগুলি প্যাটরায় ক'রে মাথায় নিয়ে টালিগঞ্জের পথ ভাঙতে হয়।

বিশে টেবিলে পা তুলে দিয়ে বললে—পা টিপে দে।

কর্তা ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। অগত্যা টিপেই দিতে হয়। কিন্তু বিশেরই জামার পকেট থেকে দু'পয়সা সরিয়ে এক টুকরো সাবান কিনে আনতে হবে দেখছি।

চেয়ারের পায়াগুলো অমরত্ব লাভ করেছে এ-কথায় কোনো সন্দেহ নেই। বিশে তো নয়, হাতি! তে-খাঁজ একটি পৈতৃক ভুঁড়ি রোজ প্রায় এক পো তেল খায়—প্রথম খাঁজে সারিসারি বিড়ি রাখে, দ্বিতীয় খাঁজে দেশলাইর কাঠি। বিশের ঘাড় লাট্টুর আল্-এর মতো এইটুকুন!

বললে—ঘাড়টা ডল্।

বিশে দোকানের হিসেব রাখে। ওর দোর্দণ্ড প্রতাপ, যখন খুশি থাবড়ায়, যখন খুশি উপোস করিয়ে রাখে।

বিশে কর্তার শালা।

'রেস্'-এর দিন। সাঁঝের শেষে বেজায় ভিড়। এইখানে ফাউল কাটলেট, ঐ ওখানে আবার ছোট কাপ। ছুটে ছুটে হা-ক্লান্ত। বিশেটা খালি বাঁ হাতে বিড়ি টানে, আর হাতে পয়সা গোনে।

—এ মক্‌বুল।

হাতের উপর চায়ের কাপটা কাত হয়ে প'ড়ে গেল। চমকে উঠলাম—বাবু! বাবু বললে—এখানে কবে থেকে? গলায় যে একেবারে পৈতে ঝুলিয়েছিস! ব্যাপার কি?

বাবু হাসে।

—সে অনেক কথা।

—আচ্ছা, চার ডিস কারি এনে দে, ফাউল।

অনেক কথা আর বলা হয় না। যাবার সময় বাবু তেমনি হাতের মধ্যে কি একটা গুঁজে দিলে। বাবুর একজন সঙ্গী বললে—আমাদেরো কনট্রিবিউশন আছে হে!

বিশে নিশ্চয়ই দেখে ফেলেছিল। সাইনবোর্ডের মাথার আলো নিবতেই দৌড়ে থপথপ করতে করতে পাশের ঘরে এসে হাঁকলে—ট্যাঁকে কি গুঁজেছিলি রে তখন?

—কখন আবার গুঁজতে গেলাম?

—হেই তখন, চশমাচোখো বাবুর ঠেঙে?

—কোথায় চশমা চোখো? কত এল গেল, কে কাকে মনে ক'রে রেখেছে!

—যা যা ফাজলামো নয়। ছাখা, কত দিলে—ব'লে ট্যাঁকে হাত দিতে চায়।

—ট্যাঁকে হাত দিস নে বিশে, খবরদার!

রাগে বিশের ভুঁড়িটা হাঁপায়।—কী? ব'লে তেড়ে এসে আমাকে একেবারে ওর ভুঁড়ির ওপর আছড়ে ফেললে। বাকি খাঁজটায় এবার আমাকেই গোঁজে আর কি! আধুলিটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে—আমার আদ্দেক।

রুখে, লাফিয়ে উঠলাম।—ইঃ? আমার রোজগেরে পয়সা। তোর কি পাওনা আছে এতে?

—আমি দোকানের ক্যাশিয়ার না ?
—তাতেই তো তোর অনেক পয়সা রোজগার। এর ওপর আবার চোখ কেন ?
—কী ?
রাগে বিশের পা-টা ধাঁই ক'রে আমার বুকের উপর এসে লাগল। কেঁদে ফেললাম। কর্তা কিন্তু বাকি মাংসটা শেষ করতে করতে হাসছে।
চোখের জল মুছতে মুছতে বললাম—বিশে আমার পয়সা নিয়েছে।
—তা তো নেবেই।—কর্তা বলে।
—বাঃ, আদ্দেকই ও নেবে ? এ কেমন কথা !
—সবটাই যে নিতে চায়নি এ তোর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি।
বিশে ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে এসে বললে—চার আনা ক্যাশিয়ার, দু'আনা তোর বেয়াদবির জন্যে ফাইন—সেটা জেনারেল-ফাণ্ড—আর এই নে। একটা দু'আনি ছুঁড়ে মারল।
কর্তা বললে—এই দু'আনা দিয়ে তোর এক ছিলিম বড়-তামাক হত রে বিশে।
বিশে একটা চোখ বুজে বললে—না, ও নিক। ওর খপছুরত চেহারাটার জন্যেই না রোজগার—ওর ওই দুটো কুচকুচে চোখের জন্য !
বিশের অসীম দয়া। কর্তা হাসে। এটা নিশ্চয় ঠিক, ইটিং হাউসের মূলধন কর্তার নয়, বিশের দিদির।

বাবুকে বললাম—খুচরো দিন।
বাবু আধুলি না দিয়ে দুটো সিকি দেয়। একটা জিভের তলায় লুকিয়ে রাখি, আরেকটা যেমন-কে-তেমন ট্যাঁকেই থাকে।

বিশে কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করলে না। বললে—রোজ রোজ যে আধুলি দেয়, হঠাৎ তার পয়সার এমনি কমতি হয়ে গেল ?

—বাবুর ট্রাম ভাড়ারই পয়সা নেই, পায়ে হেঁটে যাবে ভবানীপুরে, জানিস ?

কথা বলতে বলতে জিভটা জড়িয়ে এল। বিশে গাল দুটো দুমড়ে দিতেই সিকিটা টুপ ক'রে বেরিয়ে পড়ল।

কর্তা বললে—বেরিয়ে যে যাচ্ছিস, ভালো হচ্ছে না কাঁচা।

বাবু তেড়ে বললে—আমি ওকে নিয়ে যাচ্ছি, তোমার কী ?

—তোমার কী রাইট আছে ?

—তোমাদের মারবারই বা কী রাইট ছিল ? এইটুকুন ছেলে—মা-বাপ-হারা—কাজ করতে এসেছে ব'লেই কি গাধার সামিল হয়ে গেছে যে, তাকে যাচ্ছে-তাই ক'রে পিটবে, তার মাথা থেঁতলে রক্ত বার ক'রে দেবে ?

—আলবত দেব।

বাবু বললে—তোর প্যাটরাটা নিয়ে চল তো মক্‌বুল—একেবারে থানায় ; বেটাদের নামে আমি 'কেস্' করব।

বিশে ভয় পেয়ে গেছে। বললে—তোর মাইনেটা ?

বললাম—হিসেব ক'রে তোর দিদিকে ফিরিয়ে দিস।

থানায় নয়—প্রকাণ্ড বাড়ি। লাগোয়া মাঠটায় কে ছুটোছুটি খেলা করছিল।

—দাদা, আমাদের গরু এসেছে। দেখবে এস। ধবধবে শাদা গলাটা কেমন তুলতুলে—তুলোর মতো!—ব'লে ছুটে চ'লে গেল।

বাবু ডাকলে—আসমানি, শোন্—

আসমানির শোনবার সময় নেই।

মা বললেন—নাম মকবুল, গলায় পৈতে—এ ভারি মজা তো!

বাবু বললে—মাথায় ঝুলিয়ে দেব টিকি, দাড়িতে খোদার নুর!

চাকর-ঠাকুরদের আলাদা ঘর ছিল, তারই ছোট্ট একটা কুঠরিতে আস্তানা গাড়লাম। চাকর পছনকে দিয়ে বাবু একটা হৈ চৈ বাধিয়ে তুললে—জল ঢেলে ঝাঁট দেওয়ালে, একটা তক্তাপোশ এনে ফেললে, বিছানা পাতালে, দেয়ালে একটা ব্র্যাকেট টাঙালে পর্যন্ত। পছন বিড়বিড় ক'রে বলছিল—নবাবের নাতি এসেছে।

ঘনিয়ে ঘুম আসবার কথা, কিন্তু আসছিল না। টালিগঞ্জের মুচিপটির পনেরো নম্বরের বাড়ির দরজাটা থাকুকই না খোলা! আরো অনেক বন্ধ কবাট খুলে গেছে।

কিন্তু আমি আসামাত্রই যে প্রাণীবিশেষের শুভাগমন সংবাদটি ঘোষিত হয়েছিল তার দেখা তো কোথাও পেলাম না। মনটা খট ক'রে উঠল। গোয়ালঘর তা হলে কোনটা? আমার গলার চামড়াটা তুলতুলে বটে, রঙটা তো ধবধবে শাদা নয়। কে জানে?

গঙ্গার ঘাটে যে মেয়েটির কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটেছিলাম তার নাম জানি না। হয়তো আসমানিই।

রান্নাঘরে নয়—একেবারে কলতলায়ও নয়—মাঝামাঝি।

বাবুদের জুতো বুরুশ করি, কাপড় কোঁচাই, ঘর ঝাঁটাই, ফুট-ফরমাজ করি—দিদিমণিরো।

ন'টার সময় গাড়ি আসে। খাওয়া হয় কি না হয়—আসমানি ছুটে বেরোয়। সাজগোজ হয় ঘুম থেকে উঠেই। চামড়ার ব্যাগটা হাতে ক'রে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিই। পা-দানিতে ওঠবার সময় আমার হাত থেকে তুলে নেয়। আঙুলে আঙুল ঠেকে কি না ঠেকে।

চারটে যেন আর বাজতে চায় না। ঘোড়া দুটো যেন জিরিযে জিরিয়ে চলে। আসমানি নেমে আসে, মুখ শুকনো, খিদে পেয়েছে। মা-কে ডাকাডাকি ক'রে তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তোলে। কোনো কোনো দিন খাবার সময় বলে—এই ছোঁডা, পাখাটা খুলে দে তো।

যে-ছেলেটি সকালবেলা আসমানির মাস্টারি করে সে বিকেলে সাইকেলে আসমানিকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। সব মেয়েদের নামিযে গাড়িটা একা আসমানিকে নিয়ে আসে ঐ পাঁচটা গ্যাসপোস্ট ছাড়িয়ে লাল বাড়িটা থেকে। এইটুকুন পথ—কোথা থেকে কে জানে—সাইকেলে আসতে আসতে ছেলেটি আসমানির সঙ্গে কথা কয়। হয়তো লেখাপড়ারই কথা!

উঠোনে মস্ত খুঁটিতে গরুটা বাঁধা। আসমানি যতই ওর গলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ততই ও ওর বড বড় চোখ দুটি স্নেহে ভিজিযে মাথাটা আকাশের দিকে তুলছে। সামনে একটা মোড়ায় ব'সে আসমানির মাস্টার-ছেলেটি। একটা রুমাল নিয়ে লোফালুফি খেলছে।

সবে ভোর। মাস্টারের পডাতে আসার কথা সাতটায়। মাস্টারের ঘড়িটা নিশ্চয়ই দু'একঘণ্টা ফাস্ট চলে।

আসমানি বললে—এই ছোঁড়া, গরুর দুধ দুইবি? গয়লা আসেনি। জানিস দুইতে?

অক্ষমতার অপযশ বিনা পরীক্ষাতেই কিনতে যাই কেন? একেবারে ভাঁড় নিয়ে এসে ব'সে গেলাম.। বাঁটে সবে দু'তিন টান মেরেছি, আসমানির মাস্টার গরুর মুখে রুমাল দিয়ে বাড়ি মারতে লাগল।

গরুটা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নিতে চাইল সমুখের শিঙ দিযে নয়, পিছনের ঠ্যাং তুলে। ভাঁড় শুদ্ধ চিৎপাৎ হযে প'ড়ে গেলাম।

কী হাসি আসমানির! যেন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। আসমানির মাস্টারটার হাসি বিকট! হাসছে না তো কাশছে!

গয়লা কিন্তু এসেছিল। বললে—এ সব কি আনাড়ীর কাজ? যা যা গোবর খা গে যা!

আসমানির হাসি কিছুতেই থামতে চায় না।

মাস্টার বললে—ঠ্যাং দুটো ছড়িয়ে ব্যাঙের মতো কেমন পড়ল দেখেছ? অথচ এই ছেলেটাই দাদাবাবুর হোটেলে খাওয়ার সঙ্গী ছিল। যাবার সময রোজ বলত—আমাদেরো কন্‌ট্রিবিউশন আছে হে!

রাতে সেদিন বাড়ি ফিরে দাদাবাবু চিৎকার ক'রে উঠল—আমার বাইকের এমন দুর্দশা কে করলে?

চিৎকার তো নয়, কান্না।

আসমানি বললে—একটা সিরিযাস কলিশন হযেছে দাদা—

—কি ক'রে? আমার বাইক—

—টিমুদার সঙ্গে মক্‌বুল-মিঞার।

—মক্‌বুল? কোথায়? কি ক'রে আমার বাইক পেল?

—হ্যাঁ দাদা, আচ্ছা ক'রে ওকে হুইপ করা উচিত। ও কেন না ব'লে

তোমার বাইক নিয়ে যায়! ওকে পুলিশে দেওয়া যায় পর্যন্ত। টিমুদা আমার গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে আসছিল, ও হঠাৎ পিছন থেকে একেবারে টিমুদার বাইকের সঙ্গে ক্র্যাশ করলে। ক্র্যাশ ক'রেই দুজনে হুড়মুড় ক'রে প্রায় গাড়ির তলায় প'ড়ে গেছল আর কি!

দাদাবাবু আঁৎকে উঠে বললে—বলিস কি রে?

—ভাগ্যিস কোচমানটা গাড়ি বাগিয়ে ফেললে। তখুনি সহিস কোচমান ধরাধরি ক'রে টিমুদাকে বাড়ি নিয়ে এল। ডাক্তার বোসকে মা ফোন ক'রে আনালেন। তেমন কিছু ডেনজেরাস উন্ড্ হয়নি বললেন তো ডাক্তারবাবু। ড্রেস ক'রে ওঁরই মোটরে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। ভাগ্যিস গাড়ির চাকাটা আর একটু—ওরে বাবা।

—আর মক্‌বুল?

দাদাবাবু প্রশ্ন করলেন।

—কি জানি? ওটাকে ফ্লগ করা উচিত।

শুয়েছিলাম। দাদাবাবু ঘরে ঢুকে ডাকলে—মক্‌বুল।

—দাদাবাবু!

দাদাবাবু নিজে কুপিটা জ্বালাল। বললে—ডাক্তার তোকে কি বললে?

—ডাক্তার? কৈ, জানি না তো।

—সে কি রে? মাথায় কে ব্যাণ্ডেজ ক'রে দিয়েছে?

—পছন।

—পছন কি রে? মা। মা! ওমা!

মা এসে হাজির, সঙ্গে আসমানিও। দাদাবাবু বললেন—ডাক্তার একে দেখেনি কেন? এর ব্যাণ্ডেজ ভিজে এখনো রক্ত গড়াচ্ছে—

মা বললেন—ও মা, মক্‌বুলের আবার কখন মাথা ফাটল। খানিক আগে

টিমুর মাথা ফাটল মেয়ে-ইস্কুলের গাড়ির চাকায় সাইকেল আটকে। এ আবার কখন এ বিদঘুটে কাণ্ড বাধালে? ডাব পাড়তে গিয়ে নাকি রে? যা যা, শিগগির ডাক্তারবাবুকে ফের একটা কল দে ফোনে। আসমানি, ঠাকুরকে গরম জল চড়িয়ে দিতে বল্!

আসমানি যেতে যেতে বললে—ডাক্তার দেখাবে না আর কিছু। উচিত ল্যাশ করা—

জুতো বুরুশ করছিলাম।

টিমুদার মাথার ঘা শুকোয়নি ব'লে পড়াতে আসেনি। আসমানি একটা অঙ্ক নিয়ে মহা ভাবনায় পড়েছে। শুকনো বেণীর চুলগুলি যেন ছিঁড়ছে। এরি মধ্যে বললে—বেশ চকচকে ক'রে দিস কিন্তু রে ছোঁড়া।

বললাম—তোমার গাড়ি এখুনিই এসে পড়বে দিদিমণি—

—যা, তোর এত ভাবনা কিসের রে ছোঁড়া। এই অঙ্কটা না ক'রে কিছুতেই আমি উঠছি না। না হয় টিমুদার সঙ্গে হেঁটেই যাব স্কুলে।

টিমুদা পড়াতে পারে না, ইস্কুল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসতে পারে।

টেবিলের কাছে মুখটা এনে বললাম—কি আঁকটা?

আসমানি একেবারে তেড়ে উঠল—ফাজলামো করিস নাকি? যা, জুতোটা আরো চকচকে কর। অঙ্ক দেখতে এসেছেন!—ব'লে আপন মনে হাসতে লাগল।

বেচারীর মুখখানি বিরক্তিতে ভরা, নোয়ানো ঘাড়টি ঘামে ভিজে উঠেছে। অঙ্কের নম্বরটা দেখে ফেলেছিলাম।—রেকারিং ডেসিমেল। নিজের ঘরে এসে পাটিগণিত খুলে বসলাম। কতক্ষণই বা লাগে?

—তোমার অঙ্কের রেজাল্ট কত দিদিমণি ? ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর—

আসমানি অবাক হয়ে মুখের পানে তাকাল।

বললে—কি ক'রে জানলি ?

—ক'রে এনেছি। এই দেখ।

বালি-কাগজটা মেলে ধরলাম।

আসমানি তাড়াতাড়ি কাগজটা টেনে নিয়ে আঁকটা নিজের খাতায় টপাটপ তুলে ফেললে। বললে—ইউনিটারি মেথড জানিস ? রাতে ফর্‌টি টু একজাম্পলের প্রথম দশটা আঁক ক'রে রাখিস তো। বুঝলি ?

রাত ক'রে আমার ঘরে এসে হাজির। বললে—বাবাঃ এত টাস্ক করা যায় না। ভালগার ফ্র্যাকশান-এর সাম্‌গুলো কাল ভোরেই চাই।

বই খাতা ছুঁড়ে দিলে।

বললাম—এখানে বোসো। টপাটপ কষে ফেললাম ব'লে।

—এখানে বসব কি রে ?

আসমানি ভুরু কুঁচকোল।

—তবে চল, তোমার ঘরে যাই—

—হ্যাঁ, লোকে জানুক চাকরের কাছ থেকে আঁক শিখছে! কাল ভোরেই চাই কিন্তু, মনে থাকে যেন।

আশ্চর্য! আসমানি একবারও জিজ্ঞাসা করে না, কোথা থেকে আঁক শিখলাম! তা জানবার ওর এতটুকু প্রয়োজন নেই।

বুঝতাম, টিমুদা ওর ইংরিজির মাস্টার। বলতাম—অঙ্কের তা হলে একটা আলাদা মাস্টার রাখলেই হয়!

বলত—আমার তো অ্যাডিশ্যানাল্ নেই।

আসমানি অঙ্কের জন্য মাস্টার রাখে না, চাকর রাখে।

সক্কাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই আসমানি একটা হুলুস্থুল বাধিয়েছে! দেবদারুর আর খেজুর পাতায় ঘরের দেয়াল সাজাচ্ছে—পছন জল ঢেলে ঝাঁট দিচ্ছে মেঝেয়—মেয়ের দল কোমরে আঁচল টেনে ছুটোছুটি করছে। আসমানি বললে—মক্‌বুল, কিছু দিশি ফুল কোথা থেকে যোগাড় ক'রে আনতে পারিস লক্ষীটি? টিমুদা গেছে মার্কেটে—সেখানে তো বাহার বিলিতি ফুলের! পারবি ভাই?

লক্ষী! ভাই। আসমানির কী আজ? টাটকা জুঁইর মতো দেখতে! পা দু'খানি যেন পদ্মের পাপড়ির মতো!

—পারব।

টালিগঞ্জের পথে আবার। ফুল তো দূরের কথা, একটা সিগরেট কেনবার পয়সা নেই। তবু যোগাড় ক'রে দিতেই হবে। আসমানির হুকুম! কোথায় ফুল ফুটেছে কে জানে?

সেদিন রোদে বহুক্ষণ অন্যমনস্কের মতো টহলদারি করেছিলাম মনে আছে। কোথাও ফুল পাইনি। সে-ফুল কোথাও পাওয়া যায় না।

বাড়ি যখন এলাম, আসমানি একবার শুধোলও না কত ফুল আনলাম। ফুলের আর এসেন্সের গন্ধে ঘর আর মেয়েদের শাড়ি ভুরভুর করছে। টিমুদার গরদের পাঞ্জাবিটাও। কত রকমের গান, কত রকমের বাজনা, কত রকমের হাসি। কোনো মেয়ে টিমুদার পাঞ্জাবির বোতামের গর্তে ফুল গোঁজে, ফেরাফিরতি ধূপের কাঠি জালিয়ে টিমুদা মেয়েদের চুলের মধ্যে গুঁজে দেয়। বেজায় ফুর্তি!

আসমানি আমাকে ডেকে নিয়ে বললে—এই ছোঁড়া, আমার মখমলের চটিটা দেখেছিস—যেটা টিমুদা প্রেজেণ্ট দিয়েছিল—

—আমি কি জানি?

—তা হলে কে আর জানবে? তুই তো সাফ করতিস। বল শিগগির কোথায় আছে? খোঁজ।

পাতিপাতি ক'রে খুঁজলেও পাওয়া যায় না।

আসমানি একেবারে কান্না জুড়ে দিলে আর কি। মখমলের চটিটা না হলে ড্রেসের সঙ্গে স্যুটই করবে না। এক মাসও হয়নি টিমুদা কিনে দিয়েছে। ও টিমুদা, জুতো পাচ্ছি না।

টিমুদা হাসতে হাসতে বললে—কাকে মারতে?

—এই মক্‌বুল ছোঁড়াটাকে।

সমস্ত বাড়ি সজাগ হয়ে উঠল জুতো খুঁজতে। দাদাবাবু বললে—ইস্কুলে কোথায় ফেলে এসেছিস, কিম্বা টিমুদাকেই হয়তো উল্‌টো প্রেজেণ্ট দিয়েছিস কে জানে? কি হে টিমু?

হঠাৎ আসমানি ঘোষণা করলে—যে পাবে তাকে দুটো টাকা দেব। ওরে মক্‌বুল, ওরে পছন, খোঁজ, দু'টাকা।

টিমুদা পকেট থেকে দুটো টাকা তুলে বাজিয়ে বললে—এই ছাখ।

টাকার ভারি টানাটানি। দুটো টাকা, মন্দ কি! কতদিন একটু ধোঁয়া পর্যন্ত গিলতে পারিনি।

পছনটা একেবারে কোমর কেছে খুঁজতে লেগেছে—আঁস্তাকুড় পর্যন্ত। হাসি পায়।

ঘরে এসে প্যাটরাটা খুলে ফেললাম। বইগুলির তলায় জুতো জোড়া।

ছুটতে ছুটতে এসে বললাম—তোমার জুতো পেয়েছি দিদিমণি, দাও টাকা।

—কই? কোথায় পেলি?

আমতা আমতা ক'রে বললাম—ঐ ওখানে আলনার তলায়—

একটি মেয়ে বললে—কক্ষনো না। আমি আর শুচিদি ওখানটায় পাঁচবার খুঁজে এসেছি।

টিমুদা বললে—আমিও। তুই মিথ্যে কথা বলছিস। তুই চুরি করেছিলি। টিমুদাব আক্রোশ ছিল। তক্ষুনিই কানটা ধ'রে ফেললে।

—কান ধরবেন না বলছি, খবরদাব।

—কী? এই জুতো দিযে তোব মুখ ছিঁডব। ব'লেই টিমুদা আসমানির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলে।

—ছিঃ, একি হচ্ছে টিমু? ব'লে দাদাবাবু টিমুদাব হাত থেকে জুতোটা ছিনিয়ে নিলে।

টিমুদা বললে—ওকে তাডাও। ও ব্যাটা চোট্টা, জুতো চুরি ক'বে—

দাদাবাবু বললে—সে বিষয়ে তোমার কোশ্চেন কবাবই রাইট নেই। জুতো পাওযা গেলে দুটো টাকা দেবে এই তোমার কনট্র্যাক্ট। আব যে এই জুতো চুবি করবে সে কি জানে না এটাব দাম দু'টাকার ঢের বেশি? টিমুদার সত্যবাদিতা এতে একটুও পীডিত হয় না। দাদাবাবু আসমানির হয়ে টাকা দিতে চায়।

বলি—কি হবে টাকা নিয়ে?

আসমানির জন্মদিনের সন্ধ্যাটা আমার অপমানেব অশ্রুতে করুণ হয়ে উঠেছিল—সে কি কেউ জানে? সেইদিনই আমার চোখের জলের সত্যিকারের জন্মদিন।

ক'দিন থেকে দাদাবাবুর যেন কি হয়েছে।—ঘুর ঘুব ঘুর ঘুর—কেউ একটু খোঁজও করে না।

দাদাবাবু বললে—কলকাতা থেকে পালাই চল, মক্‌বুল।

মা বাবা কেউ বারণ করেন না, বলেন—যা ভালো বোঝ কর! যে যা ভালো বোঝে, সে তাই করে। আসমানি যদি বলে, চুল বাঁধবো না, চুল বাঁধেই না ; যদি বলে, ইস্কুল কামাই করবই, কে ওকে কামাই না করায়?

দুদিনের মধ্যেই সব গোছগাছ হয়ে গেল।—সঙ্গে পাঁড়েজি আর আমি।

ট্যাক্সিটা কদ্দূর এগোতেই দাদাবাবু নেমে বললে—আদৎ জিনিসটাই ফেলে এসেছি।—বন্দুকটা।

পিছনের ছ্যাকড়া গাড়িতে মাল আর পাঁড়েজি।

মা ব'লে দিয়েছিলেন—যে যে জায়গায়ই যাস সব সময় চিঠি দিস। তুইও দিস মক্‌বুল।

মুঙ্গেরে আসতেই পাঁড়েজি দাদাবাবুর কাছ থেকে টাকা নিযে খাবার কিনতে সেই যে গেল আর ফিরল না।

বললাম—গাড়ি যে ছেড়ে দিলে দাদাবাবু—

—দিক। মুঙ্গেরের কাছাকাছিই ওর বাড়ি। অনেক দিন বাড়ি আসেনি।

—কি হবে তা হলে?

—একটা কুকার কিনে নেব।

দাদাবাবু কর্ক-স্ক্রু দিয়ে বোতল খোলে। তারপর শুয়ে ঘুমোয়। আমি এই ফাঁকে সিগারেটের টিন থেকে গোটা দুই তিন টানি।

কোনো জায়গায়ই দাদাবাবু দু'তিন দিনের বেশি জিরোতে পারে না। তিনদিনের দিনই বলে—তল্পিতল্পা গুটো, মক্‌বুল। এ-জায়গাটায় ভারি ধুলো।

অন্য জায়গা আবার বেশি ঘিঞ্জি, কোথাও বা লোক বেশি নেই ব'লে ভালো লাগে না—বড্ড বেশি ফাঁকা।

কিন্তু সে-ফাঁকায় ফাঁকা মন ভ'রে ওঠে একদম। দাদাবাবু বললে—চমৎকার জায়গা। এখানে কোনো বাড়িতে আর গেস্ট নয়, একেবারে তাঁবু ফেলব। দাদাবাবু সত্যিসত্যিই তাঁবু ফেললে।

চারদিকে পাহাড়—ধারে নদী তো নয়, মাটির একটা রগ। যেন মৃত্যুশয্যায় প'ড়ে আছে। আহ্লাদির কথা মনে পড়ে।

দাদাবাবু কাঁধে বন্দুক ফেলে অনেক দূরে যায় পাখি মারতে। কোনো কোনো দিন আমিও যাই। মরা পাখিগুলি বাঁধে না, পাহাড়ী মেয়েদের দিয়ে দেয়। কিন্তু সবাইকে তো সমান দেয় না দাদাবাবু। যে-মেয়েটা বেশি পায়, রাত ক'রে চুপিচুপি আসে পয়সা চাইতে, বোতলের লাল পানি চাইতে।

আমি কত রাতে দূরে ঐ মরা নদীটাব পারে শুযে ঘুমিযেছি। আমার পাশে পাহাড়ী মেয়ে নয—আহ্লাদি।

প্রচুর জ্যোৎস্না—বালির মাঝে ছুঁচ চেনা যায়। জ্যোৎস্নায় ব'সে চিঠি লিখছিলাম। মা-কে নয় অবিশ্যি। লিখছিলাম—কত জায়গা দেখলাম—তারই একটা ফদ , পাঁড়েজি কেমন টাকা নিয়ে ভাগল , দাদাবাবুর শবীর তেমন সারছে না , আমি বেশ টনকো হচ্ছি—এই সব। আমাকে রোজ ভোববেলা দাদাবাবু পড়ায়—পাখি শিকাব কবি, একদিন একটা হরিণ পযন্ত মবেছিল আমাবই গুলিতে। পবে লিখি—আমাব কলকাতা ফিরে যেতেই ইচ্ছা করে এখন। তোমার চিঠি পেলে খুব খুশি হব। টিমুদা কেমন আছে ?

দাদাবাবু বললে—কোথায় গেছলি ?

—ইষ্টিশানে চিঠি ফেলতে।

আমাদের তাঁবু থেকে ইষ্টিশান মাইল তিনেকের পথ। গেঞ্জির উপর দিয়ে কাপড়ের বাঁধ—গেঞ্জির তলায় পোস্টকার্ডটা ফেলে দৌড়ে যাই সাঁ সাঁ ক'রে। যখন হাঁপাই, আস্তে আস্তে চলি।

নদীর পাড়ে বালির উপর শুই—ঘুম আসে না। দূরে গাছের পাতাগুলি আকাশের তারার সঙ্গে দুলে দুলে কথা কইতে চায়। আকাশের তারারাও কথা কইতে চায় নদীর জলের সঙ্গে। কি কথা কইতে চায় ওরা ? আমি শোনবার জন্য কান পেতে থাকি।

আসমানির চিঠি আসে না।

এই রাতে তাঁবু ছেড়ে দাদাবাবু কোথায় পালাল ? ল্যাম্পটা জ্বলছে, গ্লাশটা পুরো খাওয়া হয়নি, বোতলের ছিপি খোলা—কোথায় দাদাবাবু ? রাতে কি শিকারে বেরুল ? বন্দুকটা তো বাক্সেই আছে।

দাদাবাবু পাহাড়ের ধারে-ধারে পায়চারি করছে। যাক, বাকি গ্লাশটা আমারই জন্য রেখে গেছে বুঝি !

ঘুম ভাঙতেই দাদাবাবু বললে—কাল রাতে কি খেয়েছিলি রে পাজী ?

—তুমি যা খাও তেষ্টা পেলে।

—খবরদার, খাবি না আর।

দাদাবাবুর উপর খবরদারি করবার কেউ নেই।

দাদাবাবু বললে—ইষ্টিশানে যেতে হবে রে কলকাতার গাড়ি ধরতে।

—আজই যাব নাকি ?—লাফিয়ে উঠলাম।

—যাওয়া নয়। এস্‌কর্ট করতে।

কাকে ? আসমানিরাই আসবে বুঝি ! কাল রাতে যে নতুন আরেকটা চিঠি লিখেছিলাম, ছিঁড়ে ফেললাম। কি দরকার ?

আসমানি নয়—লম্বায় দাদাবাবুর মতোই ঢ্যাঙা, মাথায় একটুখানি কাপড় তোলা, সর্বাঙ্গে শীর্ণতা ও ক্লান্তি। কে এ?

কেউ কারুর মুখের দিকে চেয়ে প্রথম.সন্দর্শনের পরিচিত হাসিটুকু হাসলে না, একটি সম্ভাষণ পযন্ত না। মেয়েটি ধীরে-ধীরে দাদাবাবুর পিছনে আসতে লাগল। দাদাবাবু বললে—মকবুল, একটা টাঙা ঠিক কর।

গাড়োয়ানের পাশে আমি—পিছনে দাদাবাবু আর মেয়েটি।

—কিছু মালপত্র আনোনি যে?

—ফিরতি বিকেলের গাড়িতেই চ'লে যাব।

—ফিরতি গাড়ি তো কাল ভোরে।

—তবে কাল ভোরেই।

আর কথা নেই। শুধু দাদাবাবুর হাতের উপব মেয়েটিব শিথিল হাতখানি আলগোছে রাখা। টাঙা ঢিমিয়ে চলেছে।

—কি ক'রে জানলে আমার ঠিকানা? এলে যে বড!

—কলকাতার চাকরি ছেড়ে দিয়েছি।

—কি করবে এখন?

—সারাটা পথ তাই ভাবতে ভাবতে আসছি।

—চাকরি ছাড়লে কেন?

—ভালো লাগল না।

আবার চুপচাপ। একমাইল পথ শেষ হল ঐ বালিযাড়ির পর থেকে।

—মাধু।

—আমার নাম তোমার এখনো মনে আছে?

—কেন এলে তবে এখানে?

—তাই ভাবছি এখন। সত্যি বলছ বিকেলে গাড়ি নেই?

—থাকতে কি তোমার খুব কষ্ট হবে?

—ভীষণ!

তাঁবুতে এসে পৌঁছুলাম। বললাম—কে ইনি দাদাবাবু?

তারপর ফিসফিস ক'রে বললাম—বৌদি?

—দূর! আসমানিদের মিসট্রেস।

তা হলে এর কাছ থেকে আসমানির খবর পাওয়া যেতে পারে—কেন সে আমার চিঠির জবাব দিচ্ছে না!

দাদাবাবু বললে—নদীতে নাইতে যাবে মাধু? আমার একটা কাপড় দি—সেটা পরে চান করবে 'খন।

মেয়েটি বললে—না।

বললাম—সে ভারি মজা দিদিমণি। জলে দুদিক থেকে কাপড় মেলে ধরলেই মাছ আটকে যায়। আমি আর দাদাবাবু কতদিন ধরেছি। ধরাই সার, রাঁধা আর হয়নি।

দাদাবাবু বললে—তবে মক্‌বুল বালতি ক'রে জল এনে দিক, মাথাটা ধুয়ে ফেল।

তিন বালতি জল এনে ফেললাম। দাদাবাবু জল ঢেলে দিতে লাগল। তোয়ালে দিয়ে মাথাটা মুছতে যেতেই দাদাবাবু ব'লে উঠল—তোমার জ্বর মাধু?

—হ্যাঁ, একটু একটু হয়।

চুলটা মেয়েটিই মুছলে তারপর।

মেয়েটি বললে—আজকে আর কুকার নয়, ভালো ক'রে আমিই দুটো রেঁধে দিই।

দাদাবাবু বললে—তোমার শরীর ভালো নেই।

—না হয় আর একটু খারাপ হল।—মক্‌বুল!

এমন সুন্দর ক'রে আমাকে যেন কেউ ডাকেনি।—কি দিদিমণি?

দিদিমণি টাকা দেয়—ডিম মাংস কত কি আনতে বলে, গরম মশলা লঙ্কা তেজপাতা পর্যন্ত।

দাদাবাবু বললে—তোমার জ্বর, তুমি কী খাবে?

—একটু সাবু জ্বাল দিয়ে নেব। তা ছাড়া আজ তো এমনিই আমার উপোস।

—কেন?

—নিজের জন্মদিনের তারিখটাও বুঝি মনে নেই, এত ভুলো হয়েছ!

—মক্‌বুল! মক্‌বুল! দাদাবাবু গলা ফাটিয়ে ডাকতে লেগেছে। ফিরে এলাম। দাদাবাবু বললে—বাজার হবে না আজকে।

বাজার সত্যিই হল না। জন্মদিনের উৎসব উপবাসের মধ্যে দিয়ে কাটল। এ কেমনতর? বেচারা আমিও না খেয়ে থাকব নাকি?

দিদিমণি বললে—যা পারো পয়সা দিয়ে কিনে খেয়ো।

বাজারে পাহাড়ী মেয়েটার সঙ্গে দেখা। তাকে ব'লে দিলাম—আজ পয়সা নিতে তাঁবুতে যাসনে ছুঁড়ি। বুঝলি?

মেয়েটা বোঝে, হাসেও।

তাঁবুর বাইরে শুলাম। ভিতরে দু'কোণে দুটো ক্যাম্প খাট—দাদাবাবু আর দিদিমণি! ল্যাম্প নিবানো হয় না—কান পেতে থাকি—কথাও শোনা যায় না একটি।

জ্যোৎস্না রাত কালো হয়ে আসছে। চেয়ে দেখি তাঁবু থেকে কে বেরুল

—দাদাবাবু। চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আবার গেল ভিতরে। তন্দ্রা এসেছিল, কিসের আওয়াজে ঘুম ভাঙল। দিদিমণি বেরিয়ে এসেছে। ওরও ঘুম আসছে না।

সকালবেলা টাঙায় ক'রে ফের এলাম ইষ্টিশানে।

—তোমার জ্বর এখনো আছে ?

—সকালবেলাই তো হয়।

তেমনি হাতের উপর হাত। তেমনি কথা কইতে না-পারার অপরূপ অস্থিরতা।

ট্রেনে উঠে দিদিমণি বললে—তোমার জন্মদিন কবে, মক্‌বুল ?

—আজই।

—তাই নাকি ?—দিদিমণি হাসল।—তবে বাজারের বাকি পয়সাগুলো সব তোমার।

দাদাবাবু বললে—আর যদি দেখা না হয় !

—না হবে। দেখা হওয়াটাই তো মিথ্যে।

—তবে আমার জন্মদিনের সম্মান করো কেন ?

—তুমিও আমার মরণের দিনটির সম্মান রেখো।

গাড়ি ছেড়ে দিল।

তারপর শুধু শক্ত কালো লোহার অচল কঠিন দুটো লাইন !

এক হপ্তাও যায়নি।

দাদাবাবু একটা টেলি নিয়ে হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল—কালই কলকাতা-মুখো রে মক্‌বুল। নে নে সব গুছিয়ে ফেল।

—কলকাতা ? বাঁচলাম যেন।

সন্ধ্যা উতরে যেতেই হাওড়ায় এসে নামলাম। কলকাতা নয় তো আসমান। বাড়িতে কি যেন একটা গোলমাল—দূর থেকে শুনতে পাচ্ছি। কাছে এসেই একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। আলোয় আলোয় ঝলমল, ফুলে ফুলে আমের পাতায় গেট সাজানো, ছাতের উপর হোগলার ছাউনি। সানাই বাজছে।

—কোথায় এলাম দাদাবাবু ?

—কেন, বাড়িতে !

মা বললেন—ঠিক সময়ে এসেছিস যা হোক। আমি তো ভেবে মরছি। এখুনি বর এসে পড়বে। ওলো পটলি, ওঁকে খবর দে, খোকা এসেছে।

মেয়ের দল কি ভেবে উলু দিয়ে উঠল।

আমাকে বললেন—এ কে ! মক্‌বুল ? বাঃ, ছ'বছরে খাসা চেহারা হয়েছে তো ! চেনাই যাচ্ছে না। মা-কে মনে আছে রে মক্‌বুল ?

মা-কে প্রণাম করলাম। বাবা এলেন—বাবাকেও।

খানিক বাদে একটা তুমুল উল্লাস উঠল—বর এসেছে, বর এসেছে। শাঁখ, উলু, চিৎকার, গান—কত কি !

রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম। এত চাকর থাকতে অতিথি-চাকরকে হয়তো আজ দরকার হবে না। ছাই কলকাতা ! আমার সেই পাহাড়তলির শুকনো মাঠ ঢের ভালো—সেই কুয়োর ধার, সেই হিজল গাছের তলা, সেই মরা আহ্লাদি-নদীটা !—আর সেই পাহাড়ী মেয়েটাও।

বাসি বিয়ের দুপুর।

চাকরদের ব্যারাকের কোণের ঘরটা আজকাল পছন্দের। প্যাটরাটা তেমনি আছে—সেই পাটিগণিতটা, যার তলায় মখমলের চটি লুকোনো

ছিল—টিনের কৌটোটা, যেটা আমিনার কাছে জিম্মা রেখেছিলাম। তখনো বাড়িটা গিজ্‌গিজ্‌ করছিল।

তবু কেন যে বারান্দায় এলাম ঘুরতে ঘুরতে। মোটা থামটার আড়াল দিয়ে কিছু দেখা যাচ্ছিল বুঝি!

হঠাৎ কে যেন ছুটে এল। ছুটে মোটেই হয়তো নয়। না হোক। এমন অসম্ভব কথা কে কবে ভেবেছে?

ওর সর্বাঙ্গে নববধূর নবারুণ লজ্জা—দুটি চোখে সেই পাহাড়দেশের মায়া!

থামের পিছনে দাঁড়িয়ে বললে—কেমন আছ মক্‌বুল?

—ভালো আছি।

ভাবি, আসমানির কোনো অঙ্ক ফের ভুল হয়ে গেল নাকি? না, সেই ফুল তুলে আনার হুকুম?

বললে—আজকে সবাই আমাকে প্রেজেণ্ট দেবে। তুমি কিছুই দেবে না মক্‌বুল?

—আমি কি দেব? কিই বা আছে—ছাড়া প্যাটরাটা?

আসমানি একটু হাসলে। পরে আঁচলের তলা থেকে একটা সোনার হার বার ক'রে বললে—তুমি যদি এটা দাও, তা হলে ওরা একেবারে অবাক হয়ে যাবে। এটা আমারই জিনিস, তোমাকে দিলাম—তুমি এটা আবার আমাকে প্রেজেণ্ট দিও। তুমি যদি কিছু না দাও তা হলে ওরা ঠাট্টা করবে।

কেন ঠাট্টা করবে বুঝি না। আমি তো সামান্য একটা চাকর!

বললাম—দাও।

মনে কোনো দুরাকাজ্ঞা ছিল বুঝি। তাই হাত বাড়ালাম না।

আসমানি হারটা আমার পকেটের মধ্যে গুঁজে দিয়ে তাড়াতাড়ি চ'লে গেল।

নিজের ঘরে এসে পড়েছি।

পিছন থেকে পছন এসে বললে—কি রে, প্যাটরা গুছোচ্ছিস যে। চললি?

চকচকে সোনার হারটাও বুঝি দেখে ফেলেছে।

—ওটা কি রে?

—সোনার হার, কিনবি?

—কোথায় পেলি? চুরি করেছিস?

—যে ক'রেই পাই না, নিবি কিনা বল্।

হারটা হাতে তুলে নিয়ে পছন বললে—কতোতে ছাড়বি?

—এই গোটা পঞ্চাশ—

—ইঃ? পনেবোটা টাকা আছে, ত্যাখ—যদি হয়।

—দে, তাই। পনেরো টাকাই সই।

দ্বিধা করবাব সময় নেই।

পাহাডতলির রেল-ভাড়া পনেবো টাকায় হবে? কে জানে? বেরিয়ে তো পড়ি।

তখনো সানাই বেজে চলেছে—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে।

একটা কথা না বললেও চলে—বর অবশ্যি টিমুদাই।

দাদাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল—কি অজস্র বর্ষণ সেদিন। পশ্চিমের একটা খুদে ইষ্টিশানে দেখা—গাড়ি তখনো এসে ভেড়েনি, দাঁড়িয়ে ভিজছে। প্রথম তো চিনতেই পারিনি।

বললে—তুই এখানে ?

শেড্-এর তলায় ওঁকে টেনে এনে বললাম—তোমারই মতো বেরিয়েছি। কিন্তু ট্যাঁক একেবারে ফাঁক—

সহসা দাদাবাবু বললে—এ-গাড়িতে নয়, শেষরাত্রে কলকাতার গাড়িতেই ফিরে চল্।

ব'লে উঠি—না।

দাদাবাবু বললে—যেতেই হবে।

তখনো বৃষ্টি ধরেনি। রাত গড়িয়ে চলেছে। গাড়িতে উঠে মদের বোতল বার ক'রে দাদাবাবু বললে—খাবি একটু ?

বললাম—কোথায় যাচ্ছিলে, কেনই বা ফিরে চললে ? আমাকে কয়েকটা টাকা দিলেই তো পারতে, বেরিয়ে পড়তাম—

—কোথায় যেতিস ? কি রে কোথায় ?

—কোথাও না। তুমিই বা কোথায় যাচ্ছিলে ?

—জানি না। শুধু যাচ্ছিলাম—

কলকাতায় এসে দাদা একেবারে ক্ষেপে গেল। বললাম—এ-সব কি হচ্ছে দাদাবাবু ?

—তোকে আমার মানুষ করতে হবে—মানুষের মতো মানুষ। দুঃখে নিচু হবি না, ধারালো হবি—উন্মুক্ত, উদার, বেগবান !

ইস্কুলের উঁচু ক্লাশে ভরতি করিয়ে দিলে। বললে—যাতে ফেল না করিস ততটুকুন মনোযোগ দিলেই চলবে। মাসে মাসে টাকা পাবি, হস্টেলেই থাক। চিঠি দিস বরাবর। আমি চললাম—গাড়ি ছাড়বার আর মিনিট তেরো—

—সে কি, বাড়ি যাবে না ?

—কোথায় বাড়ি ?—দাদাবাবু বোঁ ক'রে বেরিয়ে গেল।

পিছু নিলাম। ইষ্টিশানে যখন এসে পৌছুলাম, পশ্চিমের গাড়ি এই একটা ছাড়ল। জোরে পা ফেলে গাড়ির পিছনে চলতে চাইলাম হয়তো—কাউকে দেখা গেল না।

শুধু একটি হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক সদ্যবিয়োগব্যথায় আকুল হয়ে কাঁদছে—ওর স্বামী নাকি এই গাড়িতেই পালালো।

একতলা হস্টেলের কোণের ঘরটায় তক্তাপোশের উপর মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকি—কতক্ষণ বাদে কে এসে ঘরে বাতি জ্বালায়।

খানিক বাদে কাছে এসে ভীরু গলায় বলে—বাড়ির জন্য মন কেমন করছে ভাই ?

বাড়িই তো বটে ?—দাদাবাবুর হৃদয়।

পাশে বসে বলে—নতুন এলে বুঝি ?

চোখ তুলে তাকাই। তাকিয়েই যেন স্নেহসম্ভাষণ করি।

বলে—এই ঘরে আমরা দুজনে থাকব। এস, তোমার বিছানাটা পাতি। বাড়ি থেকে মশারি এনেছ তো ? আনোনি ? তাহলে আমারটাই আজকে নিয়ো। ভারি মশা এখন।—ও আমাব সহ্য হয়ে গেছে—

বলি—কোথায ছিলে এতক্ষণ ?

—পড়াতে গেছলাম। একটি খোকাকে অ-আ পড়াই। দুটি টাকা দেয় মাসে। বাবাকে দিই।—ও নিজেই ব'লে চলে—বাবাকে দেখনি ? ঘণ্টা খানেক আগে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল—

চমকে উঠি—ঐ তোমার বাবা ?

—হ্যাঁ।

—কি করেন ?

—ভিক্ষা করেন।

ওর দিকে ভালো ক'রে তাকালাম। টুকরো ক'রে ছেঁড়া কাপড়ের একটি ফালি পরনে, গায়ে নোংরা একটা কোট, বোতাম নেই—যে-মশারি নিয়ে এত গর্ব, তার ভিতরে আসতে পারে না এমন জানোয়ার নেই কিছু পৃথিবীতে।

ফের বলে—বাবা পয়সা চাইতে এসেছিলেন। মাইনে পাইনি।

—কি ক'রে চলে তোমার তা হলে ?

—ইস্কুলে তো ফ্রী-ই, খাওয়ার খরচ একজন মাষ্টার দয়া ক'রে দেন—আর কিছু লাগে না। তুমি এলে ভাই, খুব ভালো হল। এই ঘরটায় একলা একলা থাকতে ভারি ভয় করত—যেন মা-কে দেখি, বাবা যেন হাত পেতে ভিক্ষা করতে আসে।

—কই তোমার মা ?

—নেই। একটি বোন ছিল ছোট, বাবা বিক্রি ক'রে দিয়েছেন। কোথায় আছে জানি না। এত দেখতে ইচ্ছা করে। ওর মুখ যেন আর একটুও মনে করতে পারি না।

ঐ বিকাশ। দুঃখের দুরপনেয় অন্ধকার—তবু আনন্দের অনিন্দ্য কমনীয়তা !

বিকাশের সঙ্গে পাঁচবছর এক নৌকায় এসেছি, ও টাঙিয়েছে পাল আমি টেনেছি দাঁড়।

ওর বাবা মারা গেল।

এক মাড়োয়ারি পুণ্য করতে কালীঘাট এসেছিলেন। তাঁর চলন্ত গাড়ির সঙ্গে একটি পয়সার জন্য ছুটতে ছুটতে ওর বাবা ভিরমি খেয়ে প'ড়ে গিয়েছিল। খালি খানিকটা রক্ত বমি করবার শক্তিই ছিল তারপর।

বিকাশ এসে বললে—খুঁজতে গেছলাম। শুনলাম হাসপাতালে নিয়ে গেছে। তারা বললে—বেঁচে নেই, দুদিন আগেই সাবাড় হয়েছে। মরার ঘরে আছে। গেলাম সেখানে—

—গেলি ?

—হ্যাঁ, অন্ধকার এঁদো ঘর, পচা ভোটকা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে নতুন আরেকটা মৃত্যুই হয় আর কি। দেশলাই জ্বালালাম—টেবিলের উপর সব গাঁদি ক'রে ফেলা হয়েছে—আমাকে দেখে সবাই যেন একসঙ্গে লাফিয়ে উঠতে চায়—বাবাকে খুঁজে পেলাম না।

বললে—চ'লে আসবার সময় মনে হল ওরা যেন লক্ষ লক্ষ হাত বাড়িয়ে আমার কাছে কি ভিক্ষা চাইছে—হয়তো আমার জীবন। না রে ?

পাঁচ বছর কাটিয়ে দিলাম ওর সঙ্গে—দেয়ালের আড়ালে—পুঁথির পোকার মতো।

এক সঙ্গে বি-এ পাশ করলাম—ঠেলেঠুলে, টায়েটুয়ে।

ও বললে—বেরুই আয় চাকরির খোঁজে।

দুজনে বেরুলাম।

বন্ধ দরজা। বললাম—ফিরে চল ভাই। ফিরে চলাই আমাদের আগে চলা—

ও বলে—না। বন্ধ দরজায় মাথা ঠুকতে হবে। মৃত্যুর দরজা অন্তত খুলবে। তোর মতো গায়ে জোর থাকত, মোট বইতাম। শরীরটা পর্যন্ত ভাঙাকুলো—তারপর—মনের মধ্যে এত ঘুণ। যাক গে, চল সেই কম্পোজিটারির জন্য দাঁড়াইগে, যত দিন না শিখি মাইনে নেব না।

ও অন্য রাস্তা ধরে। আমি বরাবর ইস্টিশানে এসে ট্রেন ধরি।

বিস্তীর্ণ মাঠ—লাঙল লাগিয়েছে।

বলি—জন-মজুরের দরকার আছে তোমার? এই গাঁয়ে নতুন এসেছি, একটা কাজ চাই। আর পাতার একটা কুঁড়েঘর।

মোড়ল আমার চওড়া চিতনো বুকটার দিকে তাকিয়ে বলে—ঐ আমার বাড়ি। একটা ঘরও আলগা আছে বটে। থেকে যেতে পারিস। বাজারে নিয়ে যেতে পারবি শাকসবজি মাথায় ক'রে? মাটি নিড়োতে পারবি?

—খুব পারব। পয়সা চাই না, শুধু দুবেলা দুমুঠো ভাত। পরে যদি দয়া ক'রে দু-চার পয়সা দাও—

থেকে গেলাম।

বাতাসি

যার যা খুশি, সে তাই ব'লে ডাকে—শ্যামলী, ডবকা –কেউ কেউ বা—আখখুটে।

ওর নব নব রূপ। কেউই মিথ্যে বলে না। যখন গা মেলে দিয়ে জিরোয়, সাঁঝের হাওয়া বয়, ওপারের খেজুরগাছের আড়ালে দিনের আলো ঝিমিয়ে আসে, ওকে শ্যামলী বললে বেমানান হয় না মোটেই। মাঝে মাঝে ভর-দুপুরে জোয়ার আসে, ও তখন যেন কৈশোর পেরিয়েছে মনে হয়—ওর সর্বাঙ্গ তখন উৎসুক লুব্ধ হয়ে ওঠে। তারপর ঝড়ের রাতে মা-হারা দুষ্টু খুকির মতো সে কী গোঙানি, যেন মাথা কুটছে।

নদীটি রঙ্গিনী।

ওপারে ভাঙন ধরেছে; এপারে মাঠ, ঐ বহুদূরের আকাশ ছুঁতে দৌড়ে ছুটেছে যেন।—বিস্তীর্ণ, বিশাল। কলাগাছের ঝোপে ঝোপে পাতার কুঁড়ে, মাঝে মাঝে মাদারের পাহারা। দূরের বেঁটে বটগাছটা মাঠের মধ্যিখানে সাক্ষীগোপালের মতো। সমস্ত মাঠটার কোলভরা ক্ষেত আনাজ-তরকারির, যখন যা ফসল ধরে তা-ই—কপি মটর আলু মুলো, —কাঁচালঙ্কা ধনেশাক পর্যন্ত। মাটির সবুজ ছেলেপিলে সব।

ওপারের মাটি ভেঙে পড়ার আওয়াজ এপার থেকে শোনা যায়।

শোনা যায় জলের নাচের নূপুর।
মাটি নিড়োতে নিড়োতে মোড়ল বলে—যাক রসাতলে ওপারের বস্তি, এপার আমার শ্রীমন্ত হয়ে উঠুক!
ওপারে পাটের কারখানা। সারাদিন ধোঁয়া ছাড়ে। ওপারের আকাশটুকুর মুখ গোমড়া, যেন মনে সুখ নেই। এপারের আকাশ একেবারে মাটির বুকের কাছে নেমে এসেছে মিতালি পাতাতে, চোখে ওর বন্ধুতার হাসি মাখা—দেখনহাসি।
আলুর চারাগুলি সবে মাথা চাড়া দিয়েছে—কড়ে আঙুলের মতো। ডগাটি দুলিয়ে দুলিয়ে আকাশকে ডাকে।
আরেক চাপ মাটি পড়ে। মোড়ল বলে—যাক লোপাট হয়ে। যত জোচ্চুরি-করা পয়সা।—দড়ি দিয়ে কড়িবাঁধা হুঁকোটায় একটা সুখটান দিয়ে বলে—আমার এই বিশ বিঘে জমির উপর মা-লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো পড়ুক, এই মাটি নিংড়েই সমস্ত গাঁয়ের মুখে ভাত দেব।
ধানের শীষগুলি হেলেদুলে যেন সায় দেয়।
আরো বলে—জমির আরো বন্দোবস্ত নেব, শুধু রাঙা আলু নয়, মাটির কৌটো থেকে সোনা বেরুবে—সোনা।
ব'লে চোখ বোজে। স্বপ্ন দেখে হয়তো—পাকা ধানের স্বপ্ন!
এই ফাঁকা মাঠটায় খালি নুলোটাকেই বেখাপ্পা লাগে। ওর বাঁ অঙ্গ যেন আকাশকে ব্যঙ্গ করছে। ও বলে, কোন মারাত্মক জ্বরে দেহের আধখানা কাবু হয়ে পড়েছে। নইলে—বাকি ইঙ্গিতটুকু ওর ডানদিকের অংশটা বেশ জোর ক'রেই জাহির করে। সেদিকটা যেমন টনকো তেমনি জোয়ান,—মাংস তো নয় লোহা, টিপলে আঙুলেই টোল পড়ে। তার জন্যেই ও এই ক্ষেত নদী আকাশ মাঠকে বেশি ক'রে উপহাস করছে মনে হয়।

ওর দিকে চাইলেই ওর খোঁড়া পা আর হুলো হাতটাই চোখে পড়ে।
ওর বাপ কিন্তু বলে উলটো কথা। জন্ম থেকেই নাকি বাঁ দিকটা বরাবর অসাড়—মোড়ল বলে। ওর মা-র দোষেই নাকি। ওর মা মরেছে, তাতে খালি মোড়লেরই হাড় জুড়োয়নি—তার অনাগত বংশধরদেরও। আরো বলে, ওটাকে মানায় ঐ কালো ধোঁযার কুণ্ডুলির মধ্যে, ঐ কারখানায়—ওর ঐ থেঁতলানো হাত-পা দুটোকে।
বাপ ছেলেকে দেখতে পারে না।

খুব সকালবেলা জাহাজ আসে। সামনে একটা ইস্টিশান—এখান দিয়ে যাবাব সময় ফুঁ দিয়ে যায়। আকাশের বুক যেন ব্যথা ক'রে ওঠে।
মোড়ল বলে—ওর ফুঁ, তক্ষুনি ঘুম ভাঙা চাই। মাঠে যাবার ডাক।
ভালোই হল।
জাহাজটার ডাকের নড়চড় হয় না। যেন অভ্যেস হযে গেছে।
আপত্তি করে খালি ভূষণের বৌ। ভূষণকে উঠতে দিতে চায না, কাঠটার উপর চেপে ধরে রাখবার চেষ্টা ক'রে বলে—ভোরবেলায ঠাণ্ডা হাওয়ায কই গা-টা একটু জিরোবে, না জন খাটতে যাওয়া—এখুনি। এ কি আবদার!
ভূষণ বলে—মোড়লের হুকুম। মজুর খাটতে এসে ভোরবেলায় বালিশ পোষায় না। তুই আর একটু না হয় গড়া।
উঠে পড়ে—জোর ক'রেই। বৌ বড ছেলেটাকে একটা থাবড়া মারে, ছোটটাকে লাথি। দুটো চেঁচাতে থাকে কাকের মতো। আরেকটা কান্নার শব্দ শোনা যায়। কেউ কেউ প্রশ্ন করে, ভূষণের তৃতীয় শিশু কবে জন্মাল ফের? উঁকি মেরে দেখি, বৌটার নাক ডাকছে।

মোড়ল বলে—বেগুনের চাঙারিটা তুইই নে, কাঁচা। তুই কোনটে নিবি বাতাসি? পুঁইশাকের ঝুড়িটা?

বাতাসি হেসে বলে—আমার মাথাটা কি এতই পটকা যে মচকে যাবে? আমার মাথার একটা বিড়ে পর্যন্ত লাগে না—খোঁপাই আমার বিড়ে। ঝিঙে-কাঁকুড়ের ঝুড়ি আমার।

দেড় ক্রোশ দূরে শহরতলির বাজার। বালির রাস্তা ধূ ধূ করে। এক দমকে পার হয়ে যাই।

নুলোটা বাড়িতে থাকে, এক হাতে বেত চাঁছে। বুড়ি কাঁথা সেলায়, চাল ঝাড়ে, শুকনো পাতা গুছিয়ে জ্বালানি করে। আর সময়ে অসময়ে আমাদের মাথা কোলের উপর টেনে নিয়ে উকুন বাছে।

বাতাসিকে বলে—এক গা বয়েস হল, বলি, চল শহরে, একটা ঘর বেঁধে তোকে রেখে আসি। এখানে কি সোয়াদটা আছে, বয়েস ভাঙিয়ে চড়া রোদে মাটি ম'লে?

বাতাসি ক্ষেপে ওঠে, বলে—তুই মর মাগী, তুই তো মা নস, রাক্ষুসী। বুড়ি হয়ে—

বুড়ি বললেই বুড়ি প্যাচার মতো মরাকান্না শুরু করে। সে যে বুড়ি নয় তাই শুধু অস্বীকার করতে চায়। যৌবনের অনেক অপরিজ্ঞাত রহস্যকথা উদ্ঘাটিত হয়—এখনো তার কি কি যোগ্যতা আছে মেয়েকে তারও একটা ফিরিস্তি দিতে ভোলে না।

মেয়েকে শাপ দেয়।—তুইও একদিন বুড়ি হবি হারামজাদি। তোর দাঁত থাকবে না, নাল গড়াবে।

হপ্তায় দুদিন ক'রে হাট বসে। সে দুদিন গরুর গাড়িটা বোঝাই হয়। নুলো হাঁকায়, পাচন চালাতে শিখেছে এক হাতে। হুঁকোটা খালি

হস্তান্তরিত হতে থাকে। বাতাসি শেষ টান দিয়ে হুঁকোটা নামিয়ে রাখতে চায় মুছে। বলি—আমাকে দে আর একটু খাই।

ওকে মুছতে দিই না। বাতাসি হুঁকো টানছে মনে হয় না, চুম্বন করছে। মুখে লাগিয়ে আরো খানিকক্ষণ ফুঁকতে থাকি।

ফিরতে ফিরতে প্রায় রাত হয়ে যায়। মাঝামাঝি পথে শ্মশান। চিতা জ্বলছিল। নুলোটা এক হাত তুলে নমস্কার করলে। দেখাদেখি বাতাসিও। হেসে বললাম—দুগগো পূজো বুঝি ওখানে ?

নুলো কিছুই বলে না। বাতাসি বললে—কালীপূজো। আগুনের জিভ মেলেছে। বাস্‌রে—

বললাম—শ্মশান থেকে মড়ার হাড় নিয়ে আসব, দেখবি বাতাসি ?

ভূষণ বাধা দিতে চায়, মোড়ল বলে—যাক না দেখি কেমন !

বাতাসি বললে—ইঃ ? মড়ার হাড় ! আন তো দেখি।

গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

নুলো বললে—আর কিছু ছাই আনিস ভাই—

—ছাই ? কি হবে ? তোর ডালিম গাছটার সার করতে ?

—মরা মানুষের ছাই—

শুধু ঐ টুকুন। আর কিছু ব্যাখ্যা ক'রে বলতে পারে না।

দৌড়ে গাড়িটা ধরলাম। বেশি দূর এগোয়নি।

—এই দেখ হাড় এনেছি বাতাসি। চোয়ালের। নিবি ?

বাতাসি শিউরে উঠল।—না না, দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি লাগছে আমার।

মোড়ল বললে—ফেলে দে ওটা। ফেলে দিলাম।

—ছাই আনতিস তো কপালে মাখতাম।

বাতাসির কী ভয় ! যেন দুটি বুক ওর থরথর ক'রে কাঁপছে।

বাতাসির লেড়ি কুত্তাটাকে সবাই দূর দূর করে। বুড়ির তো দু'চোখের ঝাল। বাতাসির কাছে কিন্তু ও-ই সাত রাজার ধন এক মাণিক। ওর মুখটা বুকের উপর নিয়ে বাতাসি ওর আঁটুল বাছে, সাবান দিয়ে নাওয়ায়; নিজের কাপড়ের পাড় ছিঁড়ে ওর গলায় ফিতে বেঁধে দেয়। মার খায় বেশি ভূষণের বৌর হাতে। বৌটার দিশে থাকে না, পোড়া কাঠটা দিয়েই মারে।

বাতাসিও তার প্রতিশোধ নেয় ভূষণের ছোট্টটাকে থাবড়ার পর থাবড়া মেরে। মাঝে মাঝে মাদারের ডাল দিয়েও। বলে—বুঝুক, পরের ছেলেকে মারলে কেমন লাগে—

ভূষণের বৌ তেড়ে এসে বলে—তাই হবে লো, পেটে কুত্তাই ধরবি—

বাতাসি জবাব দেয় না। কুকুরটাকে কোলে নিয়ে পোড়া জায়গাটায় তেলপটি লাগায়। কুকুরটা জিভ বার ক'রে লেজ নাড়তে থাকে।

নোংরা হলেও ওকে আদর করতে ইচ্ছে হয় মাঝে মাঝে। গায়ে একটুখানি হাত বুলিয়ে দিই। রাত্তে নদীর গর্জন শুনে ও যখন চেঁচাতে থাকে, ওর ঘেউ-ঘেউ শুনতে খুব ভালো লাগে আমার। নদীর যে ভাষার মানে আমরা এতদিন বুঝিনি, ও অবোলা কুকুরটা যেন তা বুঝে ফেলেছে। নদীর আর কুকুরের নিভৃত আলাপ শোনবার আশায় কান পেতে থাকি।

বটের তলায় চাটায়ে শুই। হুলো বলে—দাওয়ায় উঠে আয়।

বলি—ঠাণ্ডা সইবার মুরোদ আমার আছে। এক জ্বরেই বাত ধরেনা গায়। অকারণে নিষ্ঠুর হয়ে উঠি।

চার পাশে গা-ঢেলে-দেওয়া মাঠের মধ্যিখানে শুয়ে মনে হয়, সমস্ত শূন্য মাটি অফুরন্ত কথায় ভ'রে উঠেছে। মাঝে মাঝে অর্ধস্ফুট, কখনো বা

নিঃশব্দ—তাই মানুষের কাছে অর্থহীন! ধানের ক্ষেতের পোকা থেকে আকাশের তারা পর্যন্ত এই কথার বেতার চলেছে!

আলুর ক্ষেত থেকে বেগুনের ক্ষেতে কথা চলে। পুঁইর লতা ঝিঙের লতাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, হাওয়ায় ছুলে ছুলে কথা কয়।

কথা চলে মাটির সঙ্গে মেঘের।

ভোরবেলা গা.মুড়ি দিয়ে উঠেই কুকুরটা গোয়াল ঘরে গিয়ে ঢোকে। একটু ঘেউ ক'রে গরুগুলোকে সম্ভাষণ জানায়। গরু ল্যাজ নাড়ে—ও ওর কান ছুটো। গরু পা-টা একটু নাড়ে, ও পাশেই গুটি মেরে বসে। খানিকবাদে উঠে আবার একটু ঘেউ ক'রে বিদায় জানিয়ে আসে।

যেন ছুই অচেনা দেশের রাখীবন্ধন।

এই খোলা আকাশের তলায় সব চেয়ে ভালো মানায় কিন্তু বাতাসির যৌবন। মিতালি ওর বাতাসের সঙ্গে—সব সময়েই ছুষ্টুমি লেগে আছে। ছুটি হাত তুলে ও যখন ওর ভেজা কাপড়টা মেলে বেড়ার গায়ে গোঁজে, বাতাস ওকে ভারি ব্যতিব্যস্ত করে কিন্তু। মাঝে মাঝে বাতাসের বেয়াদবিকে শাসন পর্যন্ত করে না।

ও যেন পূর্ণতা। নদীটাকে কখনো কখনো বাতাসি ব'লেও ডাকা যায়।

বাজার থেকে ফিরবাব সময় রোজ পোস্টাপিসে গিয়ে শুধোই—বেলে-পাড়ার মাঠের কোনো চিঠি আছে—কাঁচার নামে?

কে চিঠি লিখবে? তবু—

পাগড়ি মাথায় কাকে বেলেপাড়ার মাঠ ভেঙে আসতে দেখা গেল—পিওন! মোড়লের নামে মনি-অর্ডার। কিছু কিছু মহাজনি কারবার আছে ওর। আঙুলের ছাপ নয়—পিওনের কাছে থেকে টুকরো পেনসিলটা নিয়ে হিজিবিজি কি লিখলে। চেষ্টা করলে পড়া যায়।

মোড়ল বলে—কোন গাঁয়ের মাইনর ইস্কুলে নাকি খানিক পড়েছিল ও—অনেক আগে। পড়তে ভুলে গেলেও দস্তখৎটা মুখস্ত হয়েই আছে—

আরেক দিন। এবারো মোড়ল এগিয়ে গেল। মনি-অর্ডার নয়, চিঠি—কাঁচার নামে।

বাতাসি বললে—বাঃ, সুন্দর ছাপ মারা তো দেখি। কার ঠেঙে পড়িয়ে নিবি?

—বাজারে কত বাবুই তো আসে—

দাদাবাবুর চিঠি।—জাপান থেকে লেখা। লিখেছে, পড়া কেন ছেড়ে দিলি মক্‌বুল? যা টাকা পাঠাতাম, তাতে কি চলত না? চাষবাসের মতলব মন্দ নয়, কিন্তু এম-এ ডিগ্রিটা নিয়ে নে, তোকে আমি বিদেশে আনব।

পরে আরো লিখেছে—এখান থেকে আমি ইউরোপ পাড়ি দেব মাস দুয়েকের মধ্যে। টাকার দরকার হলে লিখবি। ইচ্ছে ক'রে বয়ে যাসনে। কেমন আছিস?

বটের একটা ডালের সঙ্গে মোড়লের বেতো টাট্টুটা দড়ি দিয়ে বাঁধা। ঝিমোয় আর ল্যাজ নেড়ে নেড়ে মশা তাড়ায়।

ওর জীর্ণ পাঁজরের তলায় কত দীর্ঘশ্বাস পুঞ্জিত হয়ে আছে জানতে ইচ্ছে করে। ওর সারা গায়ে ঘা, ঘাড়ের লোমগুলি সব খ'সে পড়েছে, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠে—বাতাসে কান্নার মতো শোনায়।

শয়ন-ঘরে ও-ই আমার দোসর, কিন্তু কত অচেনা!

ওর দিকে চাইলে আর একটি ছবি মনে পড়ে—সেই শিক্ষয়িত্রী মেয়েটির বিষন্ন বিরস মুখ! সেই দাদাবাবুর হাতের উপর হাত রাখা, সেই কথা কইতে না-পারার অকথিত কান্না!

চষা মাটির গন্ধ এসে লাগছে—আলুর খোসার। তারার অস্পষ্ট আলো

ধানের শীষের উপর এসে পড়েছে, বেগুনের পাতায়। ঘোভাটাব ঘোলাটে দুই চোখে।

দাদাবাবুকে একটা চিঠি লিখতে হবে। চাষবাসই করব এমন ইচ্ছাই পরম নয়—নাও করতে পাবি। নানান ভাবে জীবনটাকে বাজিয়ে যাই। একটা একটা ক'বে তাব ছিঁড়ুক।

ঘরেব ছাঁইচে পিঁড়ের উপর ব'সে হুকো টানতে টানতে মোড়ল বললে—তামাক ভ'বে দেবে এমন একটি প্রাণী পর্যন্ত নেই।

ঝাঁকাব থেকে বোঁদল তুলতে তুলতে বুড়ি বললে—একটিকে রাখলেই হয়।

হুঁকোটা নামিয়ে বেখে, নিবস্ত কলকেটা উপুড় ক'বে পিঁড়ের গায়ে ঠুকতে ঠুকতে মোড়ল বললে—তোব বাতাসিকেই দে না। বেশ তো ডাগর হল।

কোঁচড়ে ধোঁদলগুলি রাখতে রাখতে বুড়ি বললে—তোর বয়েস কত হল? বুড়ির ঠোঁটের কোণে ঠাট্টা।

মোড়ল নিজের বুকের ছাতির দিকে চাইল। বললে—ইয়া বুকেব পাটা, এই দেখ হাতের থাবা, মাটি দ'লে এই পায়ের গাঁথনি—বয়েস? বাতাসি তোব সুখে থাকবে।

কোঁচড়টা বেঁধে বুড়ি মোড়লের কাছে ব'সে একটা টিকে ধরিয়ে ফুঁ দিতে লাগল। নতুন ক'রে আব এক ছিলিম তামাক সেজে দিতে চায়।

বললে—তোর এই বয়েসে বাতাসির মা-কে নিলেই মানায় ভালো। ব'লে খিকখিক ক'রে হাসতে লাগল।

মোড়ল বললে—খালি খালি তামাক সাজতেই না কি রে ?

হুঁকোটা মোড়লের মুখের কাছে তুলে ধ'রে বুড়ি গম্ভীর হয়ে বললে—দেখিস—

যেন ওর সারা গায়ে ভোলা যৌবনের আমেজ এসে লাগল।—ভাবখানা এমনি করলে।

মোড়ল বুঝি বুড়ির প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছে! বুড়ি উঠে চলল—একটা টান দিয়ে যাবার প্রলোভন পর্যন্ত ত্যাগ ক'রে।

বিড়বিড় ক'রে বলছে—গালের হাড় দুটো ঠেলে বেরিয়েছে, চুল অকালেই পেকে গেল।—তা আমি কি করব ? নইলে বাতাসি তো সেদিন হল—

মোড়লের হাত থেকে হুঁকোটা টেনে নিয়ে বললাম—বাতাসি তো আমার, বুড়ি-মা।

বুড়ি মুখ ঝামটা দিয়ে বললে—মর ছুঁচো,.চালচুলো নেই, জন্মের ঠিক নেই—বাতাসি!

পরে বলে—বাতাসির সারা গায়ে হীরে-জহরৎ। তখন চাষার ছেলে ? আপিসের বাবু—কাতারে কাতারে।

বুড়ির কথায় রাগি না। বটগাছটার তলায় ব'সে নিজের চওড়া বুকটা ফুলিয়ে চেয়ে থাকি। হাতের 'মাস্‌ল' শক্ত ক'রে টিপে টিপে দেখি। দেখি—

আশ্চর্য! নিজেকে ব'লে নিজেকে চমকে দিই।

চট ক'রে বিকাশের কথা মনে পড়ে যায়। কলেজে সেদিন আমাকে ও বলেছিল—আশ্চর্য! দুঃখ যা লাগে তার চেয়ে আশ্চর্য বেশি লাগে, কাঞ্চন। যাকে সাত-সাত বছর ধ'রে ভালোবাসলাম, সে মাথায় সলজ্জ ঘোমটা টেনে—কথাটা শেষ করতে পারে না, ব'লে ওঠে—আশ্চর্য।

যেন বিশ্বাস করতে চায় না। যেন নিজে নিজের ভূত দেখছে।

বি-এ ক্লাশের লাস্ট বেঞ্চিতে ব'সে ও আমাকে ওর প্রেমের গল্প বলত রোজ। বলত—হাত পাতলেই যা পাওয়া যায় হাত উপুড় করলে তা কতক্ষণ ?

আশ্চর্য !

চেয়ে দেখি, ডালিম গাছটার তলায় হুলো ব'সে, আর তার খুব কাছ ঘেঁষে বাতাসি।

এগিয়ে যাই। কোলের উপর হুলোর খোঁড়া পা-টা তুলে নিয়ে বাতাসি তাতে কি খানিকটা মাখছে।

—কি করছিস বাতাসি ?

—ওর পায়ে একটা তেল মাখছি। কবরেজ ব'লে দিয়েছে, অব্যর্থ ওষুধ। এইটুকুন শিশি ভাই, দাম নিলে সাড়ে ন'আনা।

—কোন কবরেজ ?

—তেলিবাজারের অন্নদা কবরেজ। সেই যে বে—

—বুঝেছি।

বাতাসি শহরে গিয়ে হুলোর জন্যে এই তেল কিনে এনেছে।

বললাম—মোড়ল বুঝি পয়সা দিয়েছিল ?

বাতাসি হাতের তেলোয় আরো খানিকটা তেল ঢালতে ঢালতে বললে—হ্যাঁ, মোড়ল দেবে ? জানিস, ওর এই খোঁড়া পা-টায় লাঠির বাড়ি মারে। বাপ তো না স্মুন্দি।

পরে হুলোকে বললে—তুই তোর এই জ্যাঁতা পা-টা ওর মুখের ওপর তুলে দিতে পারিস না ?

—তবে কোথায় পেলি ?

বাতাসি হাসল, বললে—ট্যাঁড়স-এর দর আজ চড়িয়ে দিয়েছি। মোড়লকে বলিস নি যেন।

কাছে মাটির ঢিবিটার উপর বসলাম।

আমার মুখে হাসি দেখে মুলো বললে—কিচ্ছু হবে না এতে। তুই বাজে চেষ্টা করছিস।

বাতাসি ধমক দিয়ে বললে—না, হবে না? কালু ধোপার বৌটার সেদিন কি বমি, নাড়িভুঁড়ি উলটে পড়ল। অন্নদা কবরেজ একটা বড়ি দাঁত দিয়ে কেটে আদ্ধেক খাইয়ে দিলে মাগীটাকে। বমিকে যেন যমে গিলে খেল। দেখিস না তোর পা তুদিনেই কেমন টনকো হয়ে ওঠে। এই হাত দিয়েই মারবি কুড়ুল, এই পা দিয়েই তোর বাপের মুখে লাথি। ব'লে জোরে জোরে মালিশ করতে লাগল।

মুলোর চোখে ঘোর লেগেছে। ছোট্ট ডালিমগাছটার ডগায় একটা ছোট্ট ফুল ফুটেছে—তার দিকেই চেয়ে আছে। গাছটা ওর নিজের হাতে পোঁতা। তুদিন পর পরই সন্ধ্যেবেলা একটা বাঁশের কাঠি দিয়ে মাপে—এ তুদিনে কতটুকুন বড় হল। গাছটা প্রথম যেদিন সরু কাঙাল তুটি ডাল আকাশের দিকে মেলে ধরল, মুলো আনন্দে গাছটার চার পাশে খোঁড়া পা-টা নিয়ে খুব নেচেছে। তুটি আঙুলে অতি আলগোছে, যেন অতি কষ্টে, সবে-গজানো কচি পাতাগুলি ছুঁয়ে বেড়িয়েছে—যেন ওদের চোখে ব্যথা লেগে যাবে, এই ভয়। কত ডাগরটি তারপর হল, কত পাতার ঘোমটা টেনে দিল—আজ বুঝি অরুণিমার আশীর্বাদ লেগে এতদিনে ফুল ফুটেছে।

বহু দিনের আলাপী বন্ধুর মতো গাছটা মুলোর দিকে চেয়ে আছে যেন।

শুধোলাম—আরাম লাগছে রে মুলো?

বাতাসি ধমক দিয়ে ব'লে উঠল—একদিনে কি ? দিন দুত্তিন যাক।
মনে হয়, হুলোর অসাড় পঙ্গু হাত-পা দুটো যেন সহসা জল-তরঙ্গের বাদ্য হয়ে উঠেছে! এখুনি যেন অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে উঠবে।
তেলে-ভেজা হাত বাতাসির।
মালিশ শেষ ক'রে বাতাসি হুলোর উপরের ঠোঁটের উপর আঙুল বুলিয়ে দিতে লাগল। তাতে মৌমাছির কালো কচি পাখার মতো গোঁফের রেখা উঠেছে।
চ'লে যাবার সময় বললাম—এই অসাধ্য সাধনা কেন করছিস বাতাসি ? মায়ের পেট থেকে যে তে-ব্যাঁকা হয়েই জন্মাল, সে আর সিধে হয় না। যতই তেল মেখে হাত লাল কর না।
বাতাসি এমন ক'রে তাকাল, যেন ওর ধারালো নখ দিয়ে এখুনি এসে মুখের উপর খামচি বসিয়ে দেবে।
বকের ঠ্যাংএব মতো কাহিল পা দুটি ফেলে ছুটতে ছুটতে হাবা এল। ওর জর ছেড়েছে। সাবা বছরে এই একবার ওর জর ছাড়ে। যখন প্রথম দখিনের হাওয়া দেয়।
ছেলেটা ম্যাবায় ভোগে। রোগা বড বড় চোখ দুটো পাঁশুটে। আকাশের দিকে চাইতেই খুশিতে উপচে গেল। আকাশের সঙ্গে ওর যেন আজ প্রথম শুভদৃষ্টি।
ফাঁকা ক্ষেতের মধ্যে দাঁডিয়ে ও ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকায চার পাশে। সরু গলাটা ঘোরাতে থাকে। শালিক ধরতে হাত বাড়িয়ে ছোটে, রোগা পা নেতিয়ে আসে। শিশির-ভেজা কপির পাতায় পাতলা হাতখানি ধীরে ধীরে রাখে, বুলোয়।

মোড়ল ক্ষেত থেকে কপি তুলে ঝুড়ি ভরে। হাবা রোদে পিঠ দিয়ে পাশে এসে বসে। দুহাতে মাটি ছানতে ছানতে বলে—এবারে কত কপি হল মোড়ল-কাকা? সবাইর ঘরে যাবে তো একটা ক'রে? আমাকে একটা দাও—ফাউ। আজ জ্বরটা ছাড়ল। মা-কে বলব কপি রাঁধতে। দুটো হলে বেশি ক'রে—

মোড়ল ওর কথায় কান দেয় না। আপন মনে বলে—নাই বা রইল কেউ পাশে। বাঁ হাতটা কেটেই বা নিক না কেন। এই এক হাতেই লাঙল চষে সোনা ফলাব।

—মোড়ল-কাকা, ধলি-গরুটা ক'সের দুধ দেয় এখন? ওর বাছুরটার রঙ কি ক'রে লালচে হল? কেমন ঢুঁ দিচ্ছে দেখ। বাঃ, ফড়িং ধরব।

আঙুলগুলি বাড়ায়, ফড়িংটা একটু উড়ে গিয়ে স'রে বসে—হাবা আর আঙুল বাড়ায় না। দেখে।

মোড়ল আপন মনে বলে—সোনার ক্ষেতের লক্ষ্মী হয়ে থাকত! —তা নয়! যাবে যখন লুঠ ক'রে লাঠিয়াল, বা খোলার ঘরে কাতরাবে যখন ব্যামোয় প'ড়ে! সেই বুঝি ভালো হবে? যাক, আমার কি? আমি এই ক্ষেতে বুক দিয়ে প'ড়ে থাকব।

হাবা আমার কাছে এসে বললে—আমাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে দাও না, কাঁচাদা! কোনোদিন ঘোড়ায় চড়িনি আমি।

বললাম—ওর সারা পিঠে যে ঘা।

ঘোড়াটার কাছে এগিয়ে এসে বললে—কই ঘা? ও কিছু না, দাও না চড়িয়ে।

একটা কলাপাতা ছিঁড়ে এনে ঘোড়ার পিঠে পেতে দিয়ে আস্তে আস্তে কোলে ক'রে তুলে দিলাম।

ঘোড়াটার দু'পাশে দু'পা ঝুলিয়ে দিয়ে ও এমন ভাবে বসল, যেন ও রাজা—সিংহাসনে বসেছে। নীল আকাশ যেন ওর রাজছত্র।

দড়ির লাগামটা একটু টেনে কঞ্চির মতো পা দুটি একটু দুলিয়ে ঘোড়াটাকে চালাতে চাইল জিভ দিয়ে শব্দ ক'রে। ঘোড়াটা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, পরে আস্তে আস্তে একটু একটু ক'রে হাঁটতে লাগল—যেন হাঁটতে পারছে না, ঘা-গুলো টন্‌টন্ করছে।

হাবা আর ঘোড়াটা যেন বন্ধু। দৌড়ে যাবার জন্যে ঘোড়াকে একটুও খোঁচাচ্ছে না কিন্তু। ঘোড়াটাও আস্তে চলেছে। ওরা যেন পরস্পরকে ভালোবেসে ফেলেছে।

ওকে কোলে ক'রে নামিয়ে দিলাম। ঘোড়ার পিঠটা একটু চাপড়ালে। পরে একদৃষ্টে নদীর দিকে চেয়ে রইল—জেলে-নৌকোরা পাল তুলে দিচ্ছে। ওর এই বাঁশপাতার মতো কাঁপুনে অথচ টলমলে দেহটিকে খাপছাড়া লাগে না। ও যেন মেঘলা আকাশের বুক-চেরা তৃতীয়া-চাঁদের এক টুকরো ঘোলাটে মলিন হাসি।

বললে—কাঁচাদা, নদীতে নাইতে যাব আজ।

—চড়ুই পাখির ডালনা খাওয়াবে—রাঙা আলুর সঙ্গে ?

—বুড়ির মাথায় মারব এই ঢিলটা ?

—নদীর মধ্যে তিমি মাছ হয়ে নৌকোগুলো গিললে কেমন হয় ?

শেষে হাত পেতে বললে—আজ আমার জ্বর ছাড়ল, কিছু বকশিশ দাও না কাঁচাদা। ব'লে হলদে দাঁতগুলি বার ক'রে হাসতে লাগল।

কোন পাড়া থেকে একটা ভেড়ার ছানা এ-পাড়ায় চ'লে এসেছে পথ ভুলে।

চষা মাটির উপর ছোট ছোট পায়ের ছোট ছোট দাগ।

বাতাসি ওর মুখটা বুকে চেপে ধ'রে বললে—বা, বাঃ, দেখ এসে মুলো, কেমন সুন্দর বাচ্চাটা!

হাবা দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে—আমার কোলে একটু দাও না বাতাসিদিদি!

সমস্তটা দিন বাতাসি ভেড়াটাকে বুকে-বুকে রাখলে। ওকে আর কুকুরটাকে একসঙ্গে নাওয়ালে, চেনা করিয়ে দিলে। কুকুরটা জিভ বার ক'রে ভেড়ার পা-টা একটু চাটল।

বিকেলবেলা দু'হাঁটু ধুলো নিয়ে ও-পাড়ার দুলাল এসে হাজির। বললে—পথ ভুলে হেতায় পালিয়ে এসেছে বুঝি? আমি সারা শহর তন্নতন্ন—

বললাম—তুই না এসে পড়লে রাত্রে বাতাসি আমাদের মাংস বেঁধে খাওয়াত। দেরি ক'রে এলে নেমন্তন্ন খেয়ে যেতে পারতিস।

বাতাসি রুখে উঠল—ককক্ষনো না। মিথ্যে বলছিস কেন? ওর গায়ে কে বঁটি তুলবে?—ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ওর গালে একটা চুমু খেয়ে বললে—দুষ্টুমি ক'রো না। বাড়িতে থেকো—মাঠে।

ভেড়াটা চ'লে গেলে কুকুরটাকে কোলে টেনে নিয়ে আঁটুল বাছতে বসল।

হাটবার। মোড়ল দুদিন বাড়ি ফেরেনি। ভূষণেরও কাল রাতে জ্বর হয়েছে। বললাম—মোড়ল বউ আনতে গেছে বুঝি?

বুড়ি ধনেশাক তুলতে তুলতে বললে—দেখি না কেমন বউ আনে। চল্লিশ বছর ছাড়া কে রাজী হয় দেখি।

এ দুদিন মুলোকে বাতাসিই বেঁধে দিয়েছে। খাইয়েও দিয়েছে এক আধ গরস।

আমি যদি বলি—আমাকে আর রাঁধাস কেন ? ঐ সঙ্গেই আর দু'মুঠ চাল নে না! বাতাসি কঠিন হয়ে বলে—তোর সমথ দুটো হাতের তো কত বড়াই করিস ! এক হাতে কাঠ ঠেলবি, আর হাতে হাতা দিয়ে ভাত নাড়বি।

বলতাম—কিন্তু ও কি ভাত মাখতেও পারে না ?

বাতাসি ক্ষেপে উঠত। বলত—না। খাইয়ে দিলে খেতে জানে।

—আমি খাইয়ে দিই তবে ?

—দে না। আঙুলে ঘ্যাচ ক'রে কামড়ে দেবে ব'লে কাঁধ দুটো ঝাঁকিয়ে হেসে উঠত।

গরুর গাড়িটা বোঝাই করছিলাম। বিকেল হয়ে এসেছে। বললাম—আজ শশার ঝুড়িটায় খুব হাঁক দেওয়া যাবে, কি বলিস বাতাসি ?

হাবা ছুটতে ছুটতে এসে বললে—আমিও হাটে যাব কাঁচাদা।

—চল্।

নুলোই গাড়ি হাঁকায়। যত বলি—বাতাসি, একটা কথা শোন। ও শুধু ঘাড়টা একটু কাত ক'রে বলে—বল্। একটুও স'রে আসে না।

অগত্যা হাবার সঙ্গেই গল্প করি।

—গাঙশালিকের ঝাঁক চলেছে।

—কাঁথার তলায় আর শুতে হবে না, ভারি মজা !

—আলু তুমি মেপে দেবে আর আমি গুনেগুনে পয়সা থাক ক'রে সাজাব ! কেমন ?

বাতাসি যে একেবারে শুয়ে পড়ল।

শুয়ে শুয়ে বাতাসি বলছে নুলোকে—রাতে একলা শুতে কাল তোর খুব ভয় করছিল, না ?

হুলো বললে—কাঁচাকে আজ শুতে বলব'খন।

—দূর!

হাট থেকে ফিরবার মুখে বললাম—তোরা একটুখানি গাড়িটা নিয়ে দাঁড়া। আমি হাবাকে একটু শহর দেখিয়ে আনছি।

হাবা যা দেখে তাই অবাক হয়ে দেখে। বলে—খাবারের দোকান! কত বোলতা ঘুরছে চারপাশে। আচ্ছা, ময়রাদেব খিদে পায় না কাঁচাদা?

—পায় বৈকি। দোকানে ঢুকলাম।

পরে একটা দর্জিব দোকানে। বললাম—এর একটা কোটের মাপ নিন তো।

হাবা আনন্দে তার গা থেকে ছেঁড়া চিটচিটে গেঞ্জিটা একটানে খুলে ফেললে। এক, দুই, তিন—আট, পাঁজর গোনা যায়। ষোল ইঞ্চি ছাতি। দোকানের সুমুখে কতগুলি মেথরের ছেলের ভিড জ'মে গেছে। হাবা ওদের দিকে এমন ক'রে চাইছে—ওরা যেন ভিক্ষুক।

—কবে কোটটা হবে কাঁচাদা?

—দু'তিন দিনের মধ্যে।

হাত তালি দিয়ে ব'লে ওঠে—মা-কে জানতেই দেব না, কাপডটা গায়ে দিযে থাকব। হঠাৎ কাপডটা খুলে নিলেই জামাটা দেখে ও চমকে যাবে। গোলাপফুল-তোলা ছিট। সব বেছে ওটাই ওর পছন্দ! বলে—কোটটায ক-টা ফুল পড়বে? গোটা কুড়ি নিশ্চয়ই।

পরে বলে—গাবার জন্য একটা ঝুমঝুমি কেনো না কাঁচাদা।

গাবা ওর ছোট ভাই।

রাস্তার পারে একটা আম গাছ—কচি আম ধরেছে।

বললে—আমাকে দুটো আম পেড়ে দাও না!

বললাম—টক আম খেলে ফের জ্বর হবে।

—এমনি না খেলেও হবে। আমার তো মোটে এ ক-টা দিন ছুটি। পরে তো ফের কাঁথার তলায় শোবই। দাও না।

উঠলাম। নামবার সময় পা পিছলে পড়ে গেলাম মাটিতে। হাঁটুটা যেন একটু মচকে গেল। এসে দেখি, ফাঁকা রাস্তা—গাড়ি নেই। ওরা একলা একলা চ'লে গেছে। হাবা বললে—কি হবে তবে?

—হেঁটেই যেতে হবে।

খোঁড়াচ্ছিলাম। হাবাও আস্তে আস্তে যাচ্ছিল। তখন অন্ধকার তার ডানা মেলেছে।

হাবা হাঁপ নিয়ে বললে—ঘোড়াটা থাকলেও বেশ হত, তুমি হাঁকাতে আর আমি তোমার পিঠ আঁকড়ে ব'সে থাকতাম।

বললাম—তুই আমার কাঁধে চড়।

—তোমার পায়ে যে লাগবে।

—লাগুক। কাঁধে তুলে নিলাম।

আমার চুলগুলো দু'হাতের আঙুল দিয়ে টেনে ধ'রে হাবা বললে—ওখানে অত আগুন কিসের কাঁচাদা?

—মড়া পুড়ছে! যাবি?

—চল না। একটু জিরিয়ে নেবে।

শ্মশানে এসে নদীর ধারটায় একটু বসলাম।

হাবা বললে—আমার ভারি ভয় করছে কাঁচাদা।

—কেন?

—ঐ তালগাছটার ওপরে কে? দুই লম্বা ঠ্যাং মেলে? এখান থেকে চল—চল।

—কোথায় লম্বাঠ ঢ্যাং ? ত্যুৎ।

—না, না। প্রকাণ্ড হাঁ-টা, লাল চোখ। চল কাঁচাদা। শিগগির। এই দিকেই যে আসছে।

কাঁধের উপর তুলে নিলাম ফের। আমার চুলগুলি ভীষণ জোরে টেনে রইল।

বলে—আর কত্‌দূর ?

বাতাসিকে গিয়ে বল্লাম—গাছ থেকে নামতে গিয়ে হাঁটুটা মচকে গেল, বাতাসি। তোর তেলটা দে না একটু মালিশ ক'রে।

বাতাসি বললে—মচকেছে তো নিশুন্দি পাতা বেঁধে রাখ না। ও তো বাতের তেল।

—তবু দে না একটু মালিশ ক'রে। সেরেও যেতে পারে শিগগির।

—কক্ষনো সারবে না এতে।

—একবার মেখেই দেখ না। একদিনেই কি আর ফল হয় ?

বাতাসি আমতা আমতা ক'রে বললে—তেল আর নেইও, ফুরিয়ে গেছে!

—সাড়ে ন'আনা পয়সা দিলে কাল কিনে এনে মেখে দিবি ?

বাতাসি ক্ষেপে উঠল।—কেন, তুই কিনে আনতে পারিস না ? তোর হাত দুটো এমন কি অথব্ব হয়েছে যে একেবারে চাকরানি চাই তেল মেখে দিতে ?

—চাকরানি কেন ? ঐ যে কোণে ইটের পাঁজার কাছে শিশিটা, ঐ তো—আছে খানিকটা তেল।

এগিয়ে আসতে দেখে বাতাসি তাড়াতাড়ি শিশিটা দু'মুঠোর মধ্যে চেপে

ধ'রে চেঁচিয়ে ব'লে উঠল—যা যাঃ, পালা! অল্প একটুখানি মাত্র আছে। কাল ভোরে ওকে মেখে দিতে হবে না?

চ'লে গেলাম।

বাতাসি বললে—বেশ হয়েছে। খুব খুশি হয়েছি। আর ক্ষ্যাপাবি খোঁড়া ব'লে?

মোড়ল ফিরে এসেছে—বউ নিয়ে নয়, কতগুলি টাকা নিয়ে।

আমাদের মাইনে দিলে। মুলোকে পর্যন্ত, গাড়ি হাঁকাবার জন্যে। বাতাসির কাছে রাখতে দিল।

বুড়ি বললে—বউ রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে কি না! পাকা দাড়ি দেখে আগুন নিয়ে আসত।

মোড়ল ধান ভানতে ভানতে বললে—জমিদার আরো জমির বন্দোবস্ত দেবে। বাগিচা করব—লিচুর। ক্ষেতের এধারে খালি সবুজ, ওধারে সোনা। টিকে থাক এখানে। হুঁকো টানবি আর সুখে থাকবি। গায়ে মাটি মেখে কত সুখ।

পরে মাটি চষতে চষতে বললে—চাইনা কাউকে। এই ক্ষেতটাই আমার বউ।

মুলো এসে বললে—বাবা, বাতাসিকে একটা নাকছাবি কিনে দাও না। ও চাইছিল।

বাপ বললে—তোর টাকার থেকেই দিস।

ওরা হাট থেকে আগেই ফিরেছে। হাবার কোটটা নিয়ে যাবার কথা আছে। তাই আমার যেতে দেরি হবে।

হাবার আবার কাল থেকে জ্বর এসেছে।

ফিরে এসে বাতাসিকে শুধোলাম—কি হয়েছে রে বাতাসি? কে কাঁদছে?

—ভূষণের বৌ।—বাতাসির চোখ মুখ ফোলা, ঝাপসা।

—হাবার হয়ে গেছে।

—কখন? কি ক'রে?

—ঘণ্টা খানেক আগে। জ্বরের মধ্যে শুঁটকি মাছের ঘণ্ট চুরি ক'রে খেয়েছিল ব'লে ওর মা সেই যে দরজার খিলটা দিয়ে ওর মাথায় বাড়ি মারল, সেই বাড়িতেই—

অথচ নদীর গোঙানির সঙ্গে ভূষণের বৌর মরা-কান্নার পাল্লা চলেছে।

ওপাড়া থেকে দুলাল এল কাঁধ দিতে। আমাকে বললে—মাদার ফেড়ে ফেলি, আয়!

মাদার গাছটার পাঁজরায় পাঁজরায় যেন কান্না। হয়তো হাবার জন্যেই—রোগা বেতো ঘোড়াটা পর্যন্ত দড়ি খুলে অস্থির হয়ে বট গাছটার চার পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরুগুলি গলা তুলে গাঢ় চোখে চেয়ে আছে—জাবর কাটছে না।

বুড়ি আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে হাপুরে গলায় ভূষণের বৌকে বললে—অত কাঁদছিস কেন লো লুটিয়ে লুটিয়ে?—এক ছেলে গেছে কত আবার হবে—

ভূষণের বৌ বুড়িকে খন্তা নিয়ে তাড়া ক'রে এল।—হারামজাদি বুড়ি, শুকনি—তোর শাপেই তো আমার হাবা—আমার হাবারে—

তারপরে নদীর ককানির সঙ্গে তাল রেখে কান্না, বিনিয়ে বিনিয়ে।

দুলো মিনতি ক'রে বললে আমাকে—তুই এবার কাঁধটা বদলা, অনেকক্ষণ নিয়ে আছিস। আমাকে দে এবার।

—তুই এতটা কাঁধই পাবি না। তুই পারবি ওদের সঙ্গে চলতে ?

মোড়ল বললে—হ্যাঁ, আমরাও ওর সঙ্গে ঠুকে ঠুকে চলি আর কি !

বাতাসি ডাক দিলে—চ'লে আয় মুলো, আমরা পিছেপিছে চলি আস্তে আস্তে।

কাঁধটা বদলালে পারতাম !

চিতায় তোলবার আগে ওর গায়ে কোটটা পরিয়ে দিলাম। মুলো পাশের সজনে গাছ থেকে কতগুলি ফুল ছিঁড়ে ওর মুখে বুকে ছুঁড়তে লাগল। যেন কোটটা প'রে ও হাসছে।

মাটির উপর মুখ থুবড়ে বাতাসির সে কী বুক-ভাঙা কান্না ! হাবা যেন ওর কে ! হাবা তো পুড়ছে না, ওর গায়েই যেন আগুন লেগেছে—ওর বুকে। তালগাছের মাথা পর্যন্ত আগুনের শীষ ওঠে—যেন দূরের তারাকে ছুঁতে চায়।

পোড়া শেষ হয়ে গেলে মুলো কতগুলো ছাই নিয়ে মুখে বুকে পায়ে সর্বত্র মাখতে লাগল। দেখাদেখি বাতাসিও।

বললাম—তোরা একরাতেই সন্ন্যেসী হয়ে গেলি নাকি ?

মুলো তেমনি বললে—মরা মানুষের ছাই—

তারপর মাটির উপর গড় ক'রে প্রণাম। বাতাসি একেবারে সাষ্টাঙ্গ।

ফিরে এসে বাতাসি কুকুরটাকে বুকে নিয়ে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কুকুরটা যেন ওর খোকা !

মুলো ওর ডালিমগাছের পাশে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

মোড়ল ভূষণকে ডেকে বললে—মন খারাপ করিস নে ভূষণ ! কত আসে যায়। সেই তো সেবার এক ক্ষেত মুলোর চারা হয়ে বৃষ্টিতে সব মারা গেল। এ ও তেমনি।

ভূষণ বললে—নাঃ। গেছে হাড় ক'খানা জুড়িয়েছে। রাত্তিরে ঘুমুতে দিত না। ঝঞ্ঝাট—মুখে বলে বটে কিন্তু চোখের জল মোছে।

মোড়ল বললে—আমারো মনটা সেবার ভারি দমে গেছল। অত ছোট খাটো দুঃখ নিয়ে থাকলে কিছুই চলে না ভাই। এই প্রকাণ্ড মাঠের প্রতিটি ঘাস আমাদের ছেলে—মাঠটা ওদের মা।

মোড়লের মনও ঠিক নেই। রাতে ক্ষেতের আল বেয়ে বেয়ে চলে, ঘুমুতে যায় না।

ঘোড়াটা মাঝে মাঝে বিকৃত শব্দ ক'রে ওঠে—ঘায়ের যন্ত্রণায় হয়তো।

সমস্ত মাঠটা যেন খাঁ-খাঁ করছে।

সে-রাতে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এল, আকাশ ভেঙে। সঙ্গে ঝড়ের দুরন্তপনা। মেঘের কালো ঝুঁটি ধ'রে ঝাঁকানি দিচ্ছে।

কলাগাছগুলি পড়ে গেল—

নদীর জল ফুলে উঠেছে, ঝড়ে মাটির ঢেলা উড়ছে, ধুলোয় সব দিক একাকার।

তার মধ্যে মুশলধারে বৃষ্টি—অন্ধকার চিরে চিরে তলোয়ারের ঝিলিক দিচ্ছে। মড়-মড় ক'রে একটা মাদারগাছও পড়ল।

শুধু কুকুরটা নদীর সর্বনাশা ডাক শুনে প্রতিধ্বনি করছে। যেন কাকে কামড়ে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে দেবে।

বাইরে বেরিয়ে এলাম—নদীর পাড়ে। নদী দুর্দমনীয়, আমার পায়ের নিচের মাটিতে চিড় ধরল। স'রে এলাম। হুড় মুড় ক'রে প'ড়ে গেল মাটির চাপটা।

নদী তা হলে এদিকেও মাথা কুটতে লেগেছে।

পিছন চেয়ে দেখি—বাতাসি। সব কাপড় চোপড় ভেজা, দুরন্ত ঝড় ওর সঙ্গে ফাজলামো লাগিয়েছে।

—উঠে এলি যে জলে?

—মুলোকে খুঁজে পাচ্ছি না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে।

দুজনে খুঁজতে লাগলাম। ধুলোয় কিছুই দেখা যায় না, চোখের উপর জলের ঝাপটা লাগে।

বললাম—আমার হাতটা ধর বাতাসি। নইলে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবি।

বাতাসি আমার হাত চেপে ধরে—ভেজা হাত, কিন্তু ভিতরের রক্ত যেন ফুটছে।

—ঐ যে, ঐ যে মুলো। একটা বিদ্যুতের ধাঁধালো আলোয় আচমকা দেখতে পেয়ে বাতাসি চেঁচিয়ে উঠল।

এগিয়ে গিয়ে দেখি মুলোর ডালিমগাছটা ঝড়ের বাড়ি খেয়ে কাত হয়ে পড়ে গেছে। মুলো সেটাকে দুহাতে আঁকড়ে ধ'রে ফের মাটিতে পোঁতবার চেষ্টা করছে।

বললাম—ও কি আর বাঁচে? ফেলে রেখে ঘরে যা। ঠাণ্ডায় এবার ডান দিকটাই বুঝি ঠুঁটো করতে চাস?

মুলো কেমন ক'রে যেন চোখের দিকে চায়—

অমনি ক'বে বিকাশও একদিন চেয়েছিল!

পরের দিনও বৃষ্টি। সমানতালে চলেছে। বুড়ি বললে—কালবোশেখী!

মোড়ল বললে—ঝড়টাই সর্বনেশে। ঝাঁকাগুলি সব পড়ে গেল। নইলে বৃষ্টিটা তো ভালোই। মাটি মেতে উঠবে।

বাজারে আজ আর কারু যাওয়া নেই। মাঠে জল থইথই করছে। মোড়লের ঘরে আজ সব্বাইর খিচুড়ির নেমন্তন্ন।

রাতেও জল ধরল না। বরং আরো বেগে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হাত-পা ছোঁড়া!

মাঝরাতে আবার উঠে এসেছি নদীর পাড়ে। ফেনিল নদী পাক খাচ্ছে—যেন নিজে নিজের চুল ছিঁড়ছে।

পিছনে ফের বাতাসি। তেমনি ভেজা গা, তেমনি বাতাসের ইয়ার্কি ওর সঙ্গে।

বললে—নদী তো নয়, মা-কালী। ব'লে হাত জোড় ক'রে প্রণাম করলে। ওপারের পাটের কারখানার খানিকটা ঝুপ ক'রে প'ড়ে গেল। নদীটা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

বললাম—উঠে এলি যে আজও? অসুখ করতে চাস বুঝি?

আমার কাছে স'রে এসে বললে—ভারি ভয় করছে, কাঁচা।

হাতটা বুঝি একটু বাড়িয়ে দিলে। জোরে চেপে ধরলাম।

—ঐ দেখ, ঐ কাঁচা, একটা নৌকো ডুবছে।

একটা ডিঙি উলটে গেল প্রায় পাড়ের কিনারে এসে। কোন লক্ষ্মীছাড়ার নৌকো? ঝড়ের তাড়নার মধ্যে আর্তধ্বনি মিলিয়ে গেল হয়তো।

—ওকি, কাপড় কাছছিস যে। ঝাপাবি নাকি?

—হাঁ, দেখছিস না, মেয়েলোক—

—ক্ষেপেছিস, কাঁচা? ব'লে পিছন থেকে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বাধা দিতে চাইল।

বাতাসির আলিঙ্গন থেকে নদীর বাহুবন্ধন বুঝি বেশি লুব্ধ করেছে। দুই হাত মেলে ঝাঁপ দিলাম। বাতাসি চিৎকার ক'রে উঠল।

আমার হাতে বুকের সন্তানটিকে ফেলে মা তলিয়ে গেলেন, জলে—অন্ধকারে।

পাড়ে যখন উঠে এলাম, শিশুটি আর নেই। আগেই হয়ে গেছে।

—দেখি, দেখি। ব'লে বাতাসি শিশুটিকে কেড়ে নিয়ে নিজের ভেজা বুকের উপর চেপে ধরল। যেন ওকে গরম করতে চায়। ওর মুখে চুমোর পর চুমো দিতে লাগল। ওই যেন ওর মা, হারা-ছেলে ফিরে পেয়েছে।

—চল চল ঘরে, কাঁচা। সেঁক দিলে এখনো বাঁচতে পারে। ব'লে আর অপেক্ষা না ক'রেই মরা শিশু বুকে নিয়ে ঘরের দিকে ছুটল। উধর্ব শ্বাসে। যেন পাগলি হয়ে গেছে।

কিন্তু বৃথা!

তৃতীয় দিনে ঝড়বৃষ্টির মাতলামি আর বুঝি সইল না। রাক্ষুসী নদীটা তার দুই পাড়ের বন্ধন ভেঙে হুড়মুড় ক'রে ডাঙায় এসে পড়েছে কোটি কোটি ফণা তুলে।

ঢেউয়ের পর ঢেউ—যেন মহাসমুদ্র।

সব ভেসে গেল—মোড়লের স্বপ্নভরা ক্ষেত মাঠ জোত জমি, বাড়ি ঘর দোর—সব। দিগন্তসীমা পর্যন্ত জলস্রোত। মধ্যরাত্রির হৃৎপিণ্ডে দুর্বার তরঙ্গতর্জন।—সমস্ত মানুষের দুর্বল আর্তকণ্ঠ ছাপিয়ে।

খানিকক্ষণ বাদে আর কিছু শোনা যায় না। কুকুরটাও ভেসেছে।

সবাই ভাসলাম, ভেসে চললাম নদীর অতর্কিত নিমন্ত্রণে—আমি, মোড়ল, ভূষণ, ভূষণের বৌ, বুকের উপরে গাবা, মুলো, মুলোর হাত ধ'রে বাতাসি—আর বুড়ি। ও-পাড়ার দুলালও। এ-পাড়া ও-পাড়া—সব।

গরু—বেতো টাট্টুটাও। আরো কত! হিসেব নেই, পাত্তাও নেই। বটগাছটা পর্যন্ত।

ভোর হয়নি, নদীর তড়কা তখনো থামেনি—তখনো ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মিছিল।

বুকের কাছে কি একটা এসে ঠেকল। যেন খানিক ভর পেলাম। ওকে সাপটে ধ'রে খানিকক্ষণ আরো ভাসা যাবে। আর যদি মরতে হয়, তো ওকে নিয়েই—তলিয়ে গিয়ে!

—কে, বাতাসি? আয়—

ও কোনো জবাব দেয় না। আঠার মতো অন্ধকারে সমস্ত আকাশ আর জল যেন আটকে গেছে।

ওকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে অবশিষ্ট শক্তিটুকু প্রয়োগ ক'রে ওর মুখে নিবিড় চুম্বন দিলাম।

আর একটা ঢেউয়ের হেঁচকা ধাক্কায় দুর্বল হাতের বন্ধন থেকে ও খ'সে ভেসে গেল।

হয়তো বানের জলে শ্মশান থেকে একটা পোড়া গাছের গুঁড়িই ভেসে এসেছিল।

মুক্তা

আবার কলকাতা। সকালে কুয়াশা, দুপুরে ধুলো, বিকেলে ধোঁয়া।
বস্তি, না আঁস্তাকুড়! সমাজের তলানিদের অতল সমুদ্র।—ভিড়ে গেছি।
সমস্তই শস্তা এখানে—প্রেম আনন্দ মৃত্যু।
একটা চাকরি পেয়ে গেছি। ট্রামের পয়সা কুড়োই।
জাঁতা ঘুপসি বস্তির বাসিন্দাদের সঙ্গে বন্ধুতা পাতাই—বেনোজলের জোয়ার।

দরজাটা খোলাই ছিল। তবু সে-ঘরে আলোকের পলকটিও পড়ে না। জমিদার-বাড়ির উঁচু পাঁচিলটা ডিঙিয়ে আসতে আসতেই রোদের হাঁপ ধরে যেন, ঝিমোয়। তারপর মাড়োয়ারিদের বেঢপ ভুঁড়িরই মতো হাসপাতালের মোটা গম্বুজটা রোদকে শুধু আড়াল ক'রে আটকেই রাখে না, চেপটে ওর টুঁটিটা যেন চেপে ধরে।. ওটার কবল এড়িয়ে এসেই ও একেবারে ভীতু রোগা ছেলের মতো সন্ধ্যার বুকে মুখ রেখে জিরোয়—অন্ধকারের চোখের জলে গ'লে গ'লে পড়ে তারপর।
কিন্তু ঐ ঘরে ওর চিরকালের কবর—

মরা মানুষের বোজা চোখ দুটো জোর ক'রে টেনে খোলাও যেমনি, তেমনিই ঐ ঘরের জানলা খোলা।

রোদ আসে না। যে-রোদে শুকনো বনে আগুন লাগে আচমকা, মজুররা যে-রোদে উপুড় হয়ে পিঠ পেতে রাস্তা খুঁড়তে খুঁড়তে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। একটি ছিটেও না।

ডাকলাম—দীনবন্ধু! পাইপ নিয়ে বেরোলি না যে এখনো?

ভোর হয়ে গেল, এখনো দীনবন্ধু ঘুমুচ্ছে কি রকম? বহু কষ্টের টিমটিমে চাকরিটাও খোয়াতে চায় বুঝি?

তক্ষুনিই চিৎকার ক'রে উঠতে হল—পুতলি, ও পুতলি, শিগগির আয়— শিগগির।

হাতে একটা জলন্ত কুপি নিয়ে পুতলি দৌড়ে এল।—কী, কী, ?

ক'টা কুপি একসঙ্গে জালিয়ে আকাশের সূর্য—কে তার হিসেব রাখে?

পুতলি হাতের কুপিটা মাটির উপর উলটে ছুঁড়ে ফেলে, গলার সমস্ত রগগুলি চিরে চিরে ছিঁড়ে, বুকের পাজরাগুলি চৌচির ক'রে ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে উঠল। মানুষের অভিধানে সে-চিৎকারের ভাষা নেই। যেমন নেই সমুদ্রের অগাধ বন্যার, যেমন নেই কালবোশেখীর।

অকালে ঘুম ভেঙে সবাই হুড়মুড় ক'রে ছুটে এল ভয় পেয়ে, লাঠি সোটা যা হাতের কাছে পেল তাই নিয়ে—হাবুল গণেশ ভজুলাল; ময়লা ছেঁড়া কাপড়টা গায়ের উপর গুছোতে গুছোতে ও-বস্তি থেকে নির্মলা পর্যন্ত, হাতে একটা কালি-পড়া টিনের লণ্ঠন। ঘুম ভেঙে কেবল এল না কোনো ফাঁকে কৃপণ আকাশের এক বিন্দু রোদ—এক চিলতে।

ঘরের লম্বালম্বি বাঁশটায় একটা নারকেলের দড়ি খাটিয়ে তাতে গলাটা এঁটে বেঁধে দীনবন্ধু ঝুলছে।

ওর কোমরের ছেঁড়া পিঁজে-যাওয়া পচা কাপড়ের টুকরোটায় বেড় তো হতই না, ভারও সইত না—তাই বুঝি নারকেলের দড়ি কিনে এনেছে। দড়িটা নতুন।

সবাই ধরাধরি ক'রে নামালাম। নেই।

নির্মলা লণ্ঠনটা ওর মুখের কাছে এনে ধরল। দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভটা বেরিয়ে পড়েছে। যেন লজ্জায় জিভ কাটছে ও।—কাপুরুষতার লজ্জায়, না-খেতে-পাওয়ার লজ্জায়।

মাথার একরাশ জট পাকানো রুক্ষ চুলের মধ্যে উকুনগুলি পর্যন্ত বেঁচে আছে।—ওরাও বাড়ি বদল করবে এবার। পোড়ো-বাড়ি ছেড়ে ভালো বাড়িতে।

সবার আগে, আগে ছিল জল ; বিধাতা একলা ব'সে ব'সে যত কেঁদে-ছিলেন—সেই কান্নার সমুদ্র। তারপর সেই কান্নার মর্ম ছেনে সুশীতল সান্ত্বনার মতো মাটি জন্মালো—সুকোমল, সহিষ্ণু।

সেই মাটি আজ কঠিন, পাষাণ হয়ে গেছে। ওরা মাটিকে বেঁধেছে। পিটছে, বিঁধছে, চাবকাচ্ছে—নিরহঙ্কার, নিরলঙ্কার, নির্বাক মাটি।

ঝুড়ি ক'রে মাটি বিক্রি হয়। এক ঝুড়ি এক পয়সা। মাটির দরে আরও অনেক কিছু—মনুষ্যত্বও।

ট্র্যাম চলে।

বিধাতার বিদ্যুৎকে ওরা লোহার তার দিয়ে বেঁধেছে—বিনা মেঘের বিদ্যুৎ। যে-বিদ্যুৎ বিধাতার অকারণ অভিসম্পাতের মতো গরিবের খড়ের ঘরেই পড়ে, যে-বিদ্যুতে সোনাপুকুরের ধারের খেজুর গাছের সারগুলি পুড়ে খাখ হয়ে গিয়েছিল—মহান গয়লা সারা বছর ফ্যা-ফ্যা করেছে।

ট্র্যাম চলে। লোহার লাইনের উপর দিয়ে লোহার চাকা ঘষড়ে ঘষড়ে—মাটির বুকে এই লোহার ভার। সব লাল লোহু যেন জমে জমে কালো লোহা হয়ে গেছে।
ডিপো থেকে লাস্ট নাম্বার লিখিয়ে নিয়ে—দুটো ঘণ্টা দিই। ট্র্যাম চলে। 'টালি' ধরে চেয়ে থাকি। আর ভাবি।

সবাই ওকে খেপাত, বলত—কি সারা দিন-রাত্তির খালি নিজের নাম আওড়াস!
দীনবন্ধু ছাতা-পড়া দাঁতগুলি বার ক'রে বলত—যে বেছে আমার এমন নাম রেখেছে তার খুরে পেন্নাম হই, বাবা। পরের দোরে আর ধন্না দিতে হয় না, নিজেকে নিজেই ডাকি। তোরাও আমাকে নাম ধ'রে ডাক, কাজ হবে।
সবাই ওকে ভেংচাত, নাকী সুরে বলত—দীনবন্ধু রে আমার!—নানান দিক থেকে, নানান রকম সুরে।
ও তেমনিই কোদালের মতো দাঁত মেলে বলত—আমি সাড়া দিই না।
সত্যিই। সাড়া দেয় না সে। হয়তো এই দীনবন্ধুর মতোই দাঁত বার ক'রে হাসে। আর—
দীনবন্ধুর একটি মাত্র ছেলে—সমস্ত জীবনের পুঁজি, মারা পড়ল মোটরের চাকার তলায়।
দীনবন্ধু সারাক্ষণ মরা থেঁতলানো ছেলেটাকে বুকের মধ্যে সাপটে রইল, একটু কাঁদলে না পর্যন্ত। অনেকক্ষণ বাদে খালি বললে—আমার ছেলে সারা দিন খাবারের জন্য রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে ফের আমারই কোলে ফিরে এসেছে। আর ওকে রাস্তায় ভিক্ষে করতে পাঠাব না।

পুতলিকে কাঁদতে দেখে বললে—কাঁদিস কেন ? আরে, এ যে দীনবন্ধুরই ছেলে—

ছেলেকে চিতায় শুইয়ে বুড়ো আমাকে বললে—জানিস, আমি সেই মোটরটাকে চিনে রেখেছি। রাস্তায় জল দেবার সময় ঠিক মতো যদি পাই, তো জল ছিটিয়ে বেটাকে নাকাল ক'রে ছাড়ব—

যে গরিব, সে এর চেয়ে আর কী বেশি প্রতিশোধ নেবে ? যা বলা উচিত, বলতে পারে না। হয়তো বলা উচিত—আমিও আমার ছেলেরই মতো ঐ মোটরের তলায় বুক পেতে দেব।

তা, প্রতিশোধ তো ও নিলই। পয়সা দিয়ে দড়ি কিনে গলায় বেঁধে।

ঐ পয়সায় যে ওর একবেলা একমুঠি জুটত, সে-কথাটা ও ভুললে কেমন ক'রে ?

পুতলি বললে—তখন কত রাত হবে কে জানে ? আমার দরজাটার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ও, আর বিড়বিড় ক'রে কি বকছিল !

—কি বকছিল ?

—কি আবার ? নিজের নামটাই বোধ হয়।

ভজুলাল বললে—আমি ওকে ডাকনু পর্যন্ত। ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন রে দীনা ? ও খালি বললে—কত রাতেই তো ঘুমুই—

নির্মলা বললে—মাঝ রাতে আমার কপাটে টোকা পড়তেই ধড়মড় ক'রে উঠনু। বললাম—কে ? খিলখিল ক'রে হেসে ও বললে—আমি দীনবন্ধু রে, তোর ঘরে শুতে দিবি ?—দূর দূর ঝাড়ু মার মুখে ! এক হপ্তার ওপর একটা আধলার মুখ দেখিনি—ছোঃ ! টোকা পেয়ে সমস্ত গা এমন ক'রে উঠেছিল ভাই—

ট্র্যাম চলে, লোহার লাইন দুটো চাকার তলায় পিষে পিষে—

টিকিটের জন্য হাত পাতলাম।

বন্ধু অবাক হয়ে খানিকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—চিনতে দেরি হচ্ছে। পরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—আরে, কাঞ্চন যে! তুমি? এখানে?

—এই, ঘুরতে ঘুরতে—

—এত ভালো পাশ ক'রে—এম-এ পড়তে গেলে না? শেষে এই? এ কি?

বললাম—চাকরি জোটে কই?

—না, তোমার আবার চাকরি জুটত না এ ছাড়া? তুমি পড়তে যাও। আমাদের না হয়—হাতটা ধ'রে ফেলে বললে—কি হে, লাগবে নাকি টিকিট?

—এই লাইনটা ভারি কড়াকড়ি ভাই। কয়েক স্টপ পরেই ইনস্পেক্টর উঠবে—

ও বুক-পকেটের উপর হাতটা চেপে ধ'রে বললে—উঠুকই না ইনস্পেক্টর, তখন কেনা যাবে। বুঝলে না, তুমি হলে বন্ধু, সাতটা পয়সা বেঁচে যায় ভাই।

কিন্তু ইনস্পেক্টর উঠলই।

ওর সমস্ত মুখ সহসা যেন ভয় পেয়ে কালিয়ে এল।—সাতটা পয়সার জন্যেই।

তাড়াতাড়ি একটা টিকিট কেটে ওর হাতে দিলাম। ও বললে—পুরনো টিকিট বুঝি? আমি নম্বরটা আঙুল দিয়ে চেপে রেখেই দেখাব—

বললাম—কোনো দরকার নেই।

নিজের জামার পকেট থেকে সাতটা পয়সা চামড়ার ব্যাগটার মধ্যে রাখলাম।

নেমে যাবার মুখে ও বললে—আপিস যাবার সময় এমনি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ভালোই হবে, ভাই। পুরনো টিকিট দিয়েই এমনি ক'রে পার ক'রে দিও। সাতটা ক'রে পয়সা বাঁচবে—সে কি যে-সে কথা? আসবার সময় তো সেই মাঠ চষেই আসব। তবু সাতটা পয়সা—ইপিকাক থারটি—এক ড্রাম পাঁচ পয়সায়। ছেলেটার জন্য ওষুধ কেনা যাবে। বুঝলে না ভাই—ত্রিশটাকার কেরানী—

মনে মনে বলি—তবে ট্র্যাম কণ্ডাক্টারই রইলাম—তোমার সাতটা ক'রে পয়সা বাঁচুক!

একটি মেয়ে উঠল—এমন পাতলা, হাত দিয়ে আলগোছে একটু টেনে তুললে হয়!

ভাবলাম, মেয়েটি কুৎসিত হোক।

কুঁজো হয়ে মুখ গুঁজে বই পড়তে লেগেছে, কোলের উপর এক গাদা বই। বইয়ের ফাঁক থেকে পয়সা বার ক'রে হাতের মধ্যে রেখে দিয়েছে। অল্পতোলা ঘোমটার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ অন্ধকারের ম'তো কালো চুলের আভাস পাচ্ছি।

দীনবন্ধুর কথা মনে পড়ে। দুই হাতের উপর জট-ওলা উকুনের ঢিপি মাথাটা মেলে রেখে চিত হয়ে শুয়ে থাকত চুপ ক'রে। নিশ্বাস নিচ্ছে—এই যেন ওর পরম সুখ!

মুখ না তুলেই পয়সাগুলি হাতের উপর ফেলে দিল। পয়সাগুলি ভেজা—ঘামে।

ফের জামার পকেট থেকে সাতটা পয়সা চামড়ার ব্যাগে রাখলাম। এ ক'টা থাক।

আশ্চর্য!

ভজুলালকে পুলিশে ধরেছে।

পুতলি বললে—গলায় দড়ি জুটল না রে তোর? আর কিছু না, আস্তাবলে ঢুকে শেষকালে ঘোড়ার গাড়ির চাকার রবার চুরি করলি?

ভজুলাল বললে—আমি কি দীনবন্ধুর মতো বোকা যে, গলায় দড়ি দিতে যাব?

মাজায় একটা দড়ি বাঁধা—পুলিশের হাতে। কিন্তু মুখে লজ্জার কালিমা নেই—এতটুকুও নয়। বরং চোখ দুটো যেন খুশিতে ফুলে উঠেছে।

পুলিশকে বললাম—মিছিমিছি কেন হাঙ্গামা করছ বাপু? কত চাও?

ভজুলাল বাধা দিয়ে বললে—তুই খেপেছিস কণ্ডাক্টার? নিক না ধ'রে। বেশ মাগনা খেতে পাওয়া যাবে জেলে!

—কেন, এখেনেও তো খাওয়া যেত গতর খাটিয়ে। এত বড় দেহটা—দুটো কাঁধ ধ'রে ঝাঁকুনি দিলাম।

ও বললে—ঘুণ ধরেছে দেহে। দেখলি তো দীনবন্ধুকে।

—ছাড়া পেলে ফের কি করবি?

পোকা-কাটা দাঁত বার ক'রে বললে—তখন দেখা যাবে। তখন্ হয়তো ধরা পড়ব না।

সত্যিই তো—ছট্টুলালের কি দোষ? ও বললে—আমি সেই কথন থেকেই ঘণ্টি দিচ্ছি—

দোষ ছাগলটারই—ঘুমোবার আর জায়গা পায়নি! একেবারে লোহার লাইনে মাথা রেখে! পাঁঠা তো নয়, বাদশাজাদা।

ট্র্যামটা দাঁড়িয়ে পড়ল। অকারণেই। এ তো দীনবন্ধুর ছেলেও নয়।

একটি বাবু বললে—চালাও না। বেলা হয়ে যাবে আপিসের।

আরেক জন বললে—ভারি তো—

বইর পাঁজা নিয়ে মেয়েটি নেমে গেছে। হয়তো ওরও কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছিল।

না-ও হতে পারে। হয়তো এই করুণ দৃশ্য ও ওর ঐ দুটি করুণ চোখ মেলে দেখতে পারে না। ওর চোখের জল বুঝি টলটল ক'রে উঠেছে। তাই।

ঝুপঝুপিয়ে এক দমক বৃষ্টি হয়ে গেল। যেন যেতে যেতে পথের মাঝে মেঘ তার ব্যথার ঘড়াটা উপুড় উজাড় ক'রে ঢেলে দিলে।

কলাপাতা ক'রে রাঁধা-মাছ হাতে নিয়ে পুতলি এসে বললে—মাছ-পাতুরি করনু তোর জন্যে। কিরে, রাঁধিসনি আজ?

বললাম—গায়ে কাপড় টেনে দে পুতলি, জ্বর হবে।

—নে, কি খাবি আজ?

—উপোস করব।

—কেন?

এ-কথার কি উত্তর দেওয়া যায়? বলা যেতে পারে—খিদে নেই, পেটটা ভার। দাদাবাবু কেন উপোস করেছিল?

গায়ে চারখানার চাদরটা জড়িয়ে নিলাম।

পুতুলি বললে—কোথা চললি? খেয়ে যা।

ঘাসের উপর কে যেন ব'সে ব'সে কেঁদে গেছে; ভেজা। আমাদের ন্যাড়া বেলগাছটা বাউলের মতো ওর কাহিল কাতর ডালগুলি উঁচিয়ে রয়েছে। যেন গান গাইছে—তাইরে নাইরে নাইরে না।

তাই। নাই নাই—সে নাই।

মনে হয়, আকাশ তার ললাটে নীলের স্বচ্ছ স্বল্প একটুখানি অবগুণ্ঠন তুলে

ধ'রে কত রহস্যময়! গৈরিক বৈরাগী পৃথিবী শ্যামলিমার স্নেহাঞ্চলখানি দেহের উপর গুটিয়ে টেনে কত মহিমাপরিপূর্ণ! জ্যোতির অবগুণ্ঠন টেনে রাত্রির নক্ষত্র আর মধ্যাহ্নের মার্তণ্ড কত দূর, ধরা-ছোঁয়ার কত বাইরে, কী অনির্বচনীয়! জমিদার-বাড়ির আলিশান গম্বুজটার কিনারে শুক্ল প্রতিপদের তন্বী পাণ্ডু ইন্দুলেখার অবগুণ্ঠনের তলায় কী সুদূর ইসারা!

—প্যাঁটরা খুলছিস যে? পুতলি বললে।

—বাজারে যাব।

—এই রাতে। কেন রে?

আকাশে একটি তারার মণিকা ফুটে উঠেছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘুঁড়তে ভালো লাগে—রাস্তারও একটা সুগোপন রহস্য আছে যেন। ও-ও কথা কয় না, বুক পেতে প'ড়ে চেয়ে থাকে।

উৎসুক কণ্ঠে পুতলি বললে—বগলের তলায় কী এই পুঁটলিটা, কি আনলি?

—তোরই জন্য।

পুতলি তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে মোড়কটা। দেখে একেবারে অবাক, স্তম্ভিত হয়ে গেছে! শেমিজ শাড়ি জ্যাকেট—পুতলি বিস্ময়ে চক্ষু ডাগর ক'রে চেয়ে বললে—আমার?

—হ্যাঁ, তোর। পর্ এ-গুলো।

—কেন দিলি ভাই এ-সব?

যদি বলি: এগুলো তোর নতুন জন্মদিনের উপহার—ও তার অর্থ বুঝবে না। বললাম—অমনি। তোর ভালো কাপড় নেই একটাও। গায়ে জামা না থাকলে কখন ঠাণ্ডা লেগে অসুখ করবে—

চমৎকার মানিয়েছে কিন্তু। আবরণের বিচিত্র বর্ণ ওকে অবর্ণনীয় করেছে।

বললাম—মাথায একটুখানি ঘোমটা টেনে দে। কপালটা একটুখানি শুধু ছোঁবে।

সত্যিই। অবগুণ্ঠনেব নিচে ওর দুটি কালো চোখ সত্যিই অপার রহস্যে ভ'রে উঠেছে। ও হাসল—ঐ হাসির স্থূল ব্যাখ্যা যেন কিছু নেই। ঐ দূর তারকাব হাসিব মানে যা, যেন তাই।

ও বললে—এবাব গাবের আঠায কালো-করা গন্ধ-ওলা জালটা কাঁধে নিযে ডোবায যাই, বাজারে যাই মাছ বেচতে ?

বললাম—আজ তো আর বাঁধিনি। কি দিযে খাব তোব মাছ-পাতুরি। শুধু শুধু ?

পুতলি খুশি হযে বললে—খাবি ? কেন, আমার ভাত তোকে বেড়ে দিচ্ছি। আমি না হয পরে দুটো ফুটিয়ে নেব।

পিতলের থালায ও পরিপাটি ক'রে ভাত গুছিয়ে জাযগাটা নিকিয়ে আসন পাতলে। ওব হাতে গডানো জল ও থালের ধাবে নুনের ছোট স্তূপটি পর্যন্ত মিষ্টি লাগছে আজ। বললে—খা। লজ্জা করিস্ নে, পেট ভ'রেই খা। দেব আবো এনে মাছ-পাতুবি ?

ওর এই সেবা পেয়ে খিদে যেন বেড়ে গেছে। বললাম—দে। কিন্তু তোর জন্য যে আব বইল না।

সবটা আমার পাতে ঢেলে দিয়ে আনন্দে বললে—না থাক। তুই-ই খা। আমিই না হয উপোস করলাম।

খাওযা হযে গেলে ঘটি ক'রে জল ভ'রে দিলে আঁচাবাব জন্যে। বিছানাটা টান ক'রে পাতলে, বালিশের কোণের ছাবপোকাগুলো দুটি আঙুল দিয়ে ধ'রে মেঝেয় ফেলে পাযের আঙুল দিয়ে টিপে টিপে মারলে।

বললে—শো। ঘুমো। এই জানলাটা বন্ধ ক'রে দি, ঠাণ্ডা লাগবে।

শুলাম। ও ওর ছেঁড়া মশারিটা তুলে এনে আমার বিছানার উপর কোনো রকমে খাটিয়ে দিলে। ছেঁড়া জায়গাটার উপর একটা কাপড় মেলে দিলে। পাখা ক'রে ক'রে মশা তাড়িয়ে মশারি ফেলে ধারগুলো বিছানার চার-পাশে গুঁজে দিলে পর্যন্ত।

আবার বললে—চুপটি ক'রে ঘুমো।

চ'লে গেল।

একটি কথা কইলাম না। একটি আঙুল ছুঁলাম না। বাইরে রেখে, ওকে কত সামনে মনে হচ্ছে। ওর দেহের এই বিস্তীর্ণ অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যেন বিদেশিনী বিদেহিনী প্রিয়াকে আবিষ্কার করছি।

মশারিটা তুলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলুম। পুতলি সেই সব জামা কাপড় শুদ্ধুই পাটির উপর শুয়ে ঘুমিয়ে আছে—না খেয়েই!

বাইরে এসে পড়েছি, সন্ন্যাসী-বেলগাছটার তলায়। একাকিনী তারার মণিকাটি এখনো জ্বলছে, ডোবেনি। খালি বলতে ইচ্ছে করছে ওকে—

—তুমি দূর বটে, কিন্তু পর নও।

একাকিনী নয়।

পিতলের হাতলটা জোরে চেপে ধ'রে সমস্ত শরীরটায় একটা ঘূর্ণি দিয়ে চলন্ত ট্র্যামটায় কে উঠল—বাঙালি সাহেব। চোখে প্যাশনে।

মাটির বাতির স্তিমিত শিখার মতো ম্লানাভ কার আর একটি দেহেও সহসা তরঙ্গ জেগে উঠল যেন, হিল্লোল। একটা ঠাসা তুবড়ি যেন ফেটে গেল, বা একটা ডাঁশা ডালিম!

—তুমি অরুণ, আরে! কলম্বো থেকে ডিরেক্ট, না ম্যাড্রাস হয়ে?

মেয়েটি লেলিহান দীপশিখার মতো ওর দেহ দীর্ঘায়ত ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—তুমি মুক্তা, সারপ্রাইজ! চমৎকার।

আমাকে ঘণ্টা দিতে ইশারা করে। গাড়িটা দাঁড়ায়।

ওরা হাত ধরাধরি ক'রে নেমে যায় তারপর। তক্ষুনি ট্যাক্সি ডেকে লাফিয়ে ওঠে। দেখি। আবার ঘণ্টা দিই—ছুটো। ট্র্যাম চলে।

পথিক মেঘ আসে—অভিসারিক। সন্ধ্যাতারাকে শুধু আড়াল ক'রে রাখে না, ডুবিয়ে ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

অবগুণ্ঠনেরই নিচে।

পুতলি ওর জামার গলাটা দেখিয়ে বললে—ছিঁড়ে যাচ্ছে।

বললাম—ছিঁড়ুক। টেনে টেনে ছিঁড়ে ফ্যাল। কাপড়টাও। আর কেন?

—আমাকে আর একটা কিনে দিতে হবে কিন্তু, গোলাপী দেখে—

—দোকানিরা সব আমার স্বমুন্দি কি না—

দান যেমন অযাচিত, প্রত্যাখানও। ও খালি বলতে পারল—বোঁচকা বাঁধছিস যে?

—চললাম কাঁধে ফেলে।

—এই রাতে? কোথায়?

—তা কে জানে?

ও আমার হাত ধ'রে বললে—পাগলামো করিস নে। থাম।

হাত ছাড়িয়ে নিলাম ওকে আঘাত দিয়েই। ফের বললে—কেন যাচ্ছিস্?

—ছোঃ! এই ঘিনঘিনে মশারির তলায় কারু ঘুম হয়—এই এঁদো খোলার

ঘরে? পিতলের থালায় খেয়ে খেয়ে আমার পিলে হয়েছে। তারপর ঢেপসি ঘুটঘুটি কালো একটা মেয়েমানুষ, সারা দিনরাত কানের কাছে ব্যাঙের মতো ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙ করছে, জামার জন্যে বায়না, কোনোদিন বা জুতোর জন্যেই হবে—কে আর তিষ্ঠোয় হেতা?

—কিন্তু চাকরি?

—তোর ভাতারের জন্যে খালি রেখে যাচ্ছি—দেখা হলে বলিস। নে, ছাড় দরজা।

দরজা ছেড়ে দেয়। পিছন থেকে একবার শুধু বলে—একটা কথা শুনে যা—মাথা খাস, পায়ে পড়ি তোর—

কে কথা শোনে? বোঁচকাটা পিঠের উপর ভালো ক'রে ফেলি খালি। পথ চলি।

অন্ধকার যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে—

মোটর সুরথ সিং-এর। চালাই আমি।

অবগুণ্ঠন শুধু উন্মোচন নয়, ছিন্ন করব, টুকরো টুকরো ক'রে। মনে এই সাধ জাগে। যেমন দীনবন্ধু অবগুণ্ঠন ছিন্ন করেছিল—

মোটর তো নয়, বাদ্যযন্ত্র একটা। নিজে তো বাজেই, আমাকেও বাজায়। বা, ও যেন ময়দানবের বুড়ো বয়সের ছোট্ট ছেলে—দামাল।

ইচ্ছে করে কোনো দুর্দান্ত বিপক্ষের সঙ্গে ধাক্কা লেগে এই বাদ্যযন্ত্র চুরমার হয়ে যাক, সঙ্গে সঙ্গে ওর কাপালিক কালোয়াং-ও। কিন্তু কেউই সামনে আসে না, আমিও এগোই না হয়তো। খালি পাশ কাটিয়ে চলা—খালি ঔদাসীন্য!

বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বললে—চাকরিটা কেন ছাড়লে ভাই ?
বললাম—আস্তে চলে ব'লে, থেমে থেমে।
—কি করবে এখন ?
—রেল ইষ্টিশানে গিয়ে বস্তার নিচে পিঠ দেব।
ও ঝাপসা চোখ ছোট ক'রে বললে—ঝগড়া ক'রে ছাড়লে বুঝি ? যেমন আমারটা গেল।
—গেছে ?
ঘাড় কাত ক'রে আস্তে বললে—গেছে। ছেলেটা মরন্ত, তবু ছুটি দেবে না, দু'ঘণ্টাও না—ছেলেটার দাম যেন তিরিশ টাকারও কম।
পরে থেমে ঢোক গিলে বললে—হয়তো তাই। ছেলেটাও গেছে।

শুধু অন্ধকার নয়, দিনের রৌদ্রও কাঁদে, তেমনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।
পরের দিনও দেখা হল। রাস্তায় দাঁড়িয়ে নয়, সঙ্গে মোটর ছিল সেদিন।
—এই করছ বল, তা বেশ।
—চড়বে ?
চড়ল। বললে—এ-চড়ায় আর কি ? শুধু শুধু—
—তোমার কাজ তো কিছু নেই। মন্দ কি, হাওয়া খেয়ে নাও একটু! হাওয়াও তো পেট ভ'রে খেতে পায় না সবাই।
হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসতে যেন ওর সঙ্কোচ হচ্ছে। এক কোণে একটুখানি জায়গা নিয়ে ও বললে—আপিস থাকলে না হয় বলতাম পৌঁছে দিয়ে আসতে। সাতটা পয়সা বাঁচত।
পরে ব্যর্থ পরিহাসের চেষ্টায় ফিকে লজ্জিত হাসি হেসে বললে—ছেলে আবার হবে, কিন্তু চাকরি কবে হবে তা যমও জানে না।

পাটের কারখানায় আগুন লাগে, খোলার বস্তিতে লাগে বসন্ত। সাবাড়, উজাড় হয়ে যায়। ভাঙা থুথ্‌ড়ো বাড়ি হঠাৎ একদিন বেচারী পথচারীদের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। পাগলা ঘোড়া গাড়ি উলটে দেয়। ছাতের উপর গায়ে কেরোসিন লাগিয়ে অবোলা বৌ ছটফট ক'রে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মরে। রাস্তার উপরে গরু জবাই হয়, আর দেবীর দুয়ারে পাঁঠা! কসাইর ছুরি চক্‌চক্‌ করে।

একটা অনন্ত দীর্ঘশ্বাসের মতো মোটর চলে—একটা অফুরন্ত হাউই।

বেটি আর একটু হলেই মোটরের তলায় পড়ে গিয়েছিল আর কি; ব্রেক টিপে ধরি। রাস্তা যেন বেটির ফুল-বাগিচা; হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে রাস্তা পার হচ্ছে! ধমক দিয়ে উঠলাম। ও তক্ষুনিই অভ্যেস মতো হাত মেলে ভিক্ষা চেয়ে বসল।

খানিকক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে থেকে উঁচু মাড়িগুলি খুলে বললে—তুই যে রে—

বললাম—তুই আজকাল ভিক্ষে করছিস নাকি? তোর চোখের পাতায় কিসের ঘা ও? একি, গলায়, হাতে, বুকে—সবখানে? কী এ-সব?

—তাইতেই তো ভিক্ষে করছি। এ-ঘা নিয়ে তো আর রাস্তায় বেরুনো যায় না, ঢাকাও যায় না কিছুতে।

—হাসপাতালে যাসনি কেন?

—নিলে না। ভরতি।

—চল দেখি তো আমার সঙ্গে, কেমন নেয় না।—দরজা খুলে দিলাম।

বন্ধুকে বললাম—তবু ওর নাম ছিল নির্মলা!

বন্ধু বললে—এখনো আছে।

ওকে বললে—বোস। আমার পাশেই!

মোটর চলতে থাকে।

বললাম—পুতলি কি করছে রে নির্মলা ?

—সেবারে বসন্ত হয়েছিল, বাঁ চোখটা কানা হয়ে গেছে।

—আর ? মুখটা পাঁচিয়ে যায়নি ?

—গলি-বদল করবার সময় কাদি ওর ফালতু বেটপকা ছেলেটা ওকে দিয়ে গেছে। সেটা পালছে।

—আর কিছু নয় ?

—আর আবার কি ? বাজারে তেমনি মাছ বেচে, চালের আড়তে ধান ঝাড়ে।

—ভজুলাল ফিরেছে জেল থেকে ?

—হ্যাঁ, সে তো কবে। আবার যে জেলে গেছে জানিস না বুঝি !

—এবার কী চুরি করেছিল ?

নির্মলা তেমনি মাড়ি বার ক'রে বললে—মেয়েমানুষ।

অগোচরে গ্রহে গ্রহে সঙ্ঘর্ষ লাগে, ধূমকেতু তার পুচ্ছ ছোঁয়ায় ! বাসুকি ঠাট্টা ক'রে গা-মোড়া দিলে লজ্জিতা মাটি হায়রান হয়ে ওঠে। শাদা মানুষ আর কালো মানুষ পরস্পরের টুঁটি আঁকড়ে কামড়া-কামড়ি করে, শেষকালে দুজনের লাল রক্তে-রক্তে কোলাকুলি হয়। রাজা সমস্ত দেশে আগুন লাগিয়ে হাততালি দিয়ে নাচে, মা শহরের গলিতে আঁচলের তলায় নিয়ে মেয়ে ফিরি ক'রে বেড়ায়। সাহারা হাহাকার করে—মোড়লের সবুজ ক্ষেতের উপর দিয়ে গর্জমানা ভৈরবী নদী তার গাত্রবাস উড়িয়ে নিয়ে চলে গিয়েছিল। তারপর—

সুরথ সিং পাশে ব'সে বললে—এবার ডিপোয়। তাই যাচ্ছিলাম। কে একটা লোক এসে বললে—হাওড়ায় যেতে হবে। সামনেই সোয়ারি—দু'পা।

—এই কিরায়াটা নিই। শেষ।

আরও দুটো ট্যাক্সি এসে জমেছে। তাতে মালপত্র বিছানা বাক্স। আমারটাতেই ওরা উঠল।

দুয়ারের পাশে পুরনারীরা শঙ্খ বাজাচ্ছে, ওদের কপালে চন্দন লেপে দিচ্ছে, আশীর্বাদ করছে। আঁচলের গেরোটা ভালো ক'রে এঁটে বেঁধে দিচ্ছে। একটি মেয়ে বললে—রাস্তায় খুলে ফেলবে জানি, শুধু কাপড়ের গেরোটা। মনেরটা—

মোটরের চিৎকারে বাকিটা শোনা যায় না। মেয়েটির কণ্ঠস্বর কেন জানি কানে ভারি করুণ লাগে।

মুক্তার কলরব মোটরের আর্তনাদকে লজ্জা দিচ্ছে। মোটরটা থামিয়ে কান পেতে শুনতে ইচ্ছা করে।

মুক্তা খালি বলছে—ছুটি, ছুটি, আকাশে আজ ছুটির ঘণ্টা বাজল।

অরুণ বলছে—পাশে তুমি, পকেটে টাকা। গোঁফটা নেই, থাকলে তা দিতাম।

অরুণ যেন শৌখিন দখিন হাওয়া, আর মুক্তা যেন চাঁপার পেয়ালা।

ইষ্টিশানে পৌছে সুরথ সিংকে বললাম—বোস একটু, এই আসছি, এলাম ব'লে।

মোটর থেকে লাফিয়ে পড়লাম।

সুরথ সিং সেদিন মোটরটা নিয়ে একলাই ডিপোয় ফিরেছে। আমার জন্যে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল, কে জানে ?

ট্রেন চলে।

ভীষণ ভিড়। দরজার ধারে খালি দাঁড়াতে পাই একটু। মুখ বাড়িয়ে চেয়ে থাকি বাইরে—অন্ধকার দেখি। দূরে চাষার ঘরে মাটির বাতি জ্বলে, বাঁশের বনে ঝিঁঝিঁ ডাকে, জোনাকিরা হলদে পলকা পাখা মেলে নেচে নেচে নিবে যায়।

কোথায় চলেছি জানি না। সারা দিনের রোজগার স্থরথ সিং-এর পাওনা অনেকগুলি টাকা পকেটে আছে। যতদূর নিয়ে যেতে পারে—

একটা ইষ্টিশানে সেই চাকরটার সঙ্গে ভাব করলাম। ওর নাম, সুন্দর।

বললাম—কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

—সে অনেক দূরে। পাঞ্জাবে। তুমি কোথায়?

—সেইখানেই।

এবার খোঁজ নিলাম। ওরা যেখানে যাবে ততদূর আমার টাকা টানবে না। তার সাতাশ মাইল এদিকে নেমে হাঁ ক'রে বাতাস খেতে হবে। যাক গে, তাই সই।

নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ালে নখ ভিজে ওঠে না—বাংলার মাটির মতো সান্ত্বনায় ভেজা, নরম নয়—রুক্ষ, তামাটে। গায়ে সবুজ নয়, গেরুয়া।

সুদূরপ্রসারিত মাঠের মধ্যে একা চুপ ক'রে ব'সে আছি।

দূরে রেল-ইষ্টিশানের ভাঙাচোরা কোলাহল আকাশের তন্দ্রালুতায় ব্যাঘাত করছে। ওরা আমাকে সাতাশ মাইল পিছনে ফেলে গেল।

পকেটে কানাকড়িও নেই। দাদাবাবু আর চিঠি লেখেনি, বহুদিন। কোথায় ভেসে গেছে—কিছুই জানি না।

দাঁড়াই। তারপর পা ফেলে ফেলে চলি, রেল-লাইন ধ'রে, সামনে খাল পড়লে সাঁতরে পার হয়ে যাই।

মুহূর্তের শোভাযাত্রা চলেছে, ঋতুর মিছিল, তৃণের অভিযান, তারার নৃত্য, প্রাণবুদ্‌বুদের স্রোত। আমি চলতে চাই, আমার বুকে অগাধের সাধ জেগেছে—অবাধ। পা যখনই ছুমড়ে পড়তে চায়, তখন দৌড়ে চলতে চেষ্টা করি। পরিশ্রান্ত হয়ে যেতে ইচ্ছা করে।

কার সন্ধানে চলেছি। নীল পাখির, নীল ফুলের, নীল আকাশের।

পৌঁছনো গেল। কিন্তু পয়সা নেই। জীবনে সব চেয়ে প্রকাণ্ড 'নেই'। কিম্বা হয়তো সব চেয়ে প্রকাণ্ড 'থাকা' এই অসীম ক্ষুধা, এই রিক্ত নগ্ন উদার দারিদ্র্য—অসহায় নিদারুণ মৃত্যু!

সত্যিসত্যিই বস্তা বইব। এক বাবুকে বললাম—কেন মিছিমিছি গাড়ি করছেন? মাইল দুয়েকের মধ্যে বাড়ি হয় তো বলুন, কাঁধে ক'রে নিয়ে যাই। সঙ্গে তো জেনানা নেই—এটুকু হাঁটতে আপনার কষ্ট হওয়া উচিত নয়।

ভদ্রলোক মুখের দিকে চেয়ে খুশি হয়ে বললেন—বেশ তো, পারবে বইতে এত সব?

—বহুৎ খুব। দিন এটা কাঁধের ওপর দিয়ে গলিয়ে। ব্যস। চলুন—

ঘাম মুছে রাস্তায় বেরোতেই সুন্দরের সঙ্গে দেখা।

—বাকি পথটা পাওদলেই এলাম। কিন্তু ভাই, একটাও আধলা নেই। মোট বয়ে মোটে এই দুটো আনি পাওয়া গেল—ঢের। একটা কোথাও কাজ-টাজের সুবিধে হতে পারে, জানো?

—আরে! আমি যে লোকের খোঁজেই বেরিয়েছি। মাঠ সাফ করতে পারবে—গাছ গাছাড়ি কেটে? বাবুরা টেনিস খেলবেন।

—নিশ্চয় পারব। পুকুর কাটতে বল, গাছ ফাড়তে বল—সব।

—লঙ্কা ডিঙোতে ?

—তাও।

সন্ধ্যাসন্ধিতে টেনিস-কোর্ট তৈরি হয়ে গেল। অরুণই সব তদারক করলে। মুক্তার সারা দেহে ফূর্তি যেন আর ধরে না, সাগরের মতো অতল, ডাগর চোখের কোণে বেয়ে উপচে উপচে পড়ে। নতুন দেশের আবহাওয়ায় ওর গালে এত সকালেই লাল ফুটেছে।

ও যেন একটি গীতিকবিতা, ভাটার টানের ভাটিয়াল সুর। ও যেন মধ্যদিনের অলস তপ্ত শ্রান্তিকর দুপহরে ভ্রমরের চপল অস্ফুট গুনগুনানি।

আমি আর সুন্দর দুদিক থেকে বল কুড়োই।

মুক্তা পারে না, আর হাসে। বলে—তুমি খালি খালি প্রত্যেক বার জিতবে, এ হবে না। 'নভিস'-এর সঙ্গে খেলে আমিও জিততে পারি।

অরুণ ইচ্ছে ক'রে এদিকে ওদিকে ভুল ক'রে মারে তারপর।

একটা বল আচমকা এসে মুক্তার কপালের উপর লাগল। মুক্তা কপালে হাত চেপে উহু করে, আর খিল খিল ক'রে হাসে—লুটিয়ে লুটিয়ে। তারপর হাঁপায়।

খেলা সাঙ্গ হয়। সুন্দর পর্দা আর নেট গুছোয়। ওরা পাশাপাশি র‍্যাকেট দুলিয়ে দুলিয়ে বেড়ায় মাঠে মাঠে। আমি ফিরে যাই, ইস্টিশানের কাছে কুলির বস্তিতে।

মুহূর্তের ঠেলায় কতদূরে এসে ঠেকেছি। ইচ্ছে হল, ফিরে যাব। নীল আকাশ খালি পঞ্চনদীর তীরেই নয়, যেখানে দাঁড়াই, সেখানেই, মাথার

উপর। আঠা দিয়ে অসীমের অবগুণ্ঠন চারদিক থেকে আটকানো। তাকে তোলা যায় না, খোলা যায় না, ভোলাও যায় না যে—

এ কার বেগার খাটছি? ঘাড়ে ব্যথা ধরেছে। চাইছি আহ্লাদির সেই বালিশটা, কোনো মা-র সুকোমল একখানি কোল।

ভোঁতা ভুটিয়া কুলি-মেয়েটা বে-আক্কেল, ওর মধ্যে একটুও ভান নেই। তাই ভাল্লো লাগে না।

সুন্দরের সঙ্গে দেখা ক'রে যাব। ওর টালির ঘরে ব'সে তামাক টানছে।

—কি হে, টেনিস-কোর্টে যে আবার চোরকাঁটা গজিয়েছে। দেব নাকি সাফ ক'রে?

—দরকার নেই। বাবুরা খেলে না আর।

—কেন?

—বাবু আজ দিন দশেক হল দিল্লি যাবার নাম ক'রে যে বেরিয়েছেন, আর পাত্তা নেই। গিন্নিমা যে একলাটি আছেন, সেদিকে হুঁসই নেই যেন। খালি একটা খোট্টা-ঝি।

আমার হাতে হুঁকোটা চালান ক'রে গলার স্বর নামিয়ে বললে তারপর—এমন পরীর মতো বৌ ছেড়ে ফুরফুরির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে কি না—

—বাবু কি করে রে?

—কোথায় নাকি খনি পেয়েছে আভের, তাইতেই দেদার পয়সা। বেবাক ঢালল ব'লে—

—যা তা কি বলছিস, সুন্দর? যাক, আমি কালই চ'লে যাচ্ছি এখান থেকে।

—কেন? কোথায়?

হেসে বলি—দিল্লিতেই।

ও মুখ ভার ক'রে বলে—আমারও টিকছে না মন। বিষম দায়।

—যাই, গিন্নিমার পায়ের ধুলো নিয়ে আসি।

সুন্দর অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকায়। কিছু বলবার আগেই পা ফেলি ঘরের দিকে—

দূর থেকে মুক্তাকে দেখা যাচ্ছে, হেমন্তের ধূসর উদাস সন্ধ্যার মতো। জানলার কাছে ব'সে ফ্যাকাশে আলোয় বই পড়ছে। তাই ওকে বেশি নিঃসঙ্গ, বেশি বিষণ্ণ মনে হচ্ছে। আর কিছু নয়, দূরে একটা চেয়ারে বসব শুধু, তারপর সাহিত্য, দেশ, ধর্ম, রাজনীতি—এই নিয়ে তর্ক আর আলোচনা। ভিক্টর হিউগো, বায়রন, ডষ্টয়ভস্কি থেকে যতদূর খুশি—এ-ই ইয়েটস পর্যন্ত। প্রতিভার দীপ্তিতে দুজনের চক্ষু উজ্জ্বল, নতুন-নতুন অসাধারণ তথ্য আবিষ্কারে দুজনের বুক উৎফুল্ল। মন কি রকম জোয়ান হয়ে ওঠে! বিজ্ঞানের বিদ্রোহ, সঙ্গীতের সুরা—যা ওর ভালো লাগে।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলাম। পায়ের শব্দ শুনে সচকিতে সতর্ক প্রশ্ন এল—কে?

—আমি।

যেন কত পরমাত্মীয়! শুধু ঐ টুকুতেই সবটুকু পরিচয়।

—কে তুমি? কি চাও এখানে?

—সুন্দরকে খুঁজতে এসেছিলাম।

—তার মানে? সুন্দর কি দোতলায়—এই বাড়িতে থাকে নাকি? কে তুমি? যাও বেরিয়ে। এই সুন্দর!

চলে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ কি ভেবে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পিছু থেকে ডাকলে—শোন। তুমি—আপনি—আপনি কি অসিতার দাদা? যে আমাদের সঙ্গে পড়ত?—কেমন চেনা চেনা লাগছে। না না, তুমি

আমার সেই ছেলেবেলাকার মণ্টুদা, নয় কি? হ্যাঁ, তুমি এখানে কি ক'রে এলে, কবে? রোস—তোমার কথা—

বাধা দিয়ে বলি—না, আমি কেউ নই।

মুক্তার ভুল ভাঙে। চেঁচিয়ে বলে—কে তবে তুমি?

—আমি পিয়াদা, মুসাফির। বাঙালীই বটে। ভাগ্যের সঙ্গে কুস্তি করতে করতে এখানে এসে ঠিকরে পড়েছি।

বইটা মুড়ে রেখে বলে—সুন্দরের কাছে কেন এসেছিলে?

—যদি একটা কাজ-টাজ যোগাড় ক'রে দিতে পারে। বিরানা মানুষ।

—এতদিন কি করতে?

—পিঠ পেতে বস্তা বইতাম, না পেলে টহল করি, আর কি। নিজে তো উপোসীই, পকেট দুটোও হাঁ ক'রে আছে। পয়সা না পাই তো হেঁটেই পাড়ি দেব বাঙলাদেশ।—সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বুকটা ফুলিয়ে কথা কই।

মুক্তা ওর মোহে-মাখা দুটি চোখ কমনীয় ক'রে বলে—সত্যি যদি মণ্টুদা হও তো বল। তোমাকে যে আমার ভারি চেনা লাগছে। ঘুড়ি ওড়াতে ছাত থেকে পড়ে গেছলে তুমি, সেই রাতটা কত কেঁদেছিলাম! এতদিন হয়ে গেল, তবু—

—না না, কেউ নই আমি। আমি ইষ্টিশানের কুলি একটা।

নেমে যাই সিঁড়ি বেয়ে। ও জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে—আমাদের শিগগিরই একটা শাম্পানি আসবে, আর দুটো গরু। তুমি হাঁকাতে পারবে?

—হ্যাঁ।

—খানায় ফেলে দেবে না?

—না।

—তবে থেকে যাও। পায়ে হেঁটে বাঙলাদেশে গিয়ে কাজ নেই।
—আচ্ছা, নমস্কার।—হাত জোড় ক'রে কপালে ঠেকালাম।
ও ওর তর্জনীটি হেলিয়ে বললে হেসে—তুমি মণ্টু দাই। নিশ্চয়।

শাম্পানি এল, দুটো বয়েল-ও এল, আমিই লাগাম লাগালাম।
ল্যাজ তুলে জাঁদরেল গরু দুটো বেতোয়াক্কা হয়ে ছোটে। মুক্তা আবার ওদের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিয়েছে, দেহাতি বালির রাস্তা ধূলায় ধূলায় ধূ-ধূ করে।
কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটে, কুয়ো থেকে গেঁয়ো মেয়েরা ঘড়ায় ক'রে জল তুলে কাঁকালে ক'রে বয়।
মুক্তা সেই অকারণ ভুলের ভেলা ফেলে দিয়েছে। আমাকে বইলম্যান ব'লেই চিনেছে, এর বেশি কিছু নয়।
ভোরবেলা শিশির না শুকোতেই গাড়ি জুততে বলে, ওর নিজের চোখের পাতায় তখনো ঘুমের শিশির ঢোলে, হয়তো বা অনিদ্রার কুয়াশা। আকাশে ফিনফিনে পাতলা মেঘ পায়চারি ক'রে বেড়ায়।
কোনো কথা কয় না। খালি গরুর গলার ঘণ্টা বাজে—ভোরের উদাস, বিভোর ভৈরবীর মতো। আমার মাঝে কি যেন আবিষ্কার করবার আশায় মাঝে মাঝে অতল অপলক চোখে খানিক তাকায়। ঘনশ্যাম নিবিড় বনানীর চাহনি।

এক একদিন বলে—তোমার দেশের গল্প বল, পদ্মার।

গল্পটা জোড়াতালি দিয়ে শেষ করি। সে কী বিপুল বন্যা, কী উত্তাল ফেনিল জলস্রোত, ভালোবাসার মতো। ক্ষেত-খামার, গোলা-আড়ত, সব ভেসে গেল ; চোখ মুখ বুক—জীবন মরণ ইহকাল পরকাল।

ওর চোখ দুটি একটু কাঁপে।

বলে—কেন দেশ ছাড়লে ? কোন দুঃখে ?

—আকাশকে আড়াল করবার জন্য যে-দুঃখে মানুষ ঘর বাঁধে, সেই সমান দুঃখেই পথ নিয়েছি !

গাড়িটা ফেরে। চঞ্চল পাখির অস্ফুট কূজনের সঙ্গে তাল রেখে মৃদু মৃদু ঘণ্টা বাজে।

মুক্তা আবার প্রশ্ন করে—কে তোমার আছে ?

—দুটো পা, আর পথ, পৃথিবী। আর হাত ধ'রে ধ'রে চলেছে আমার সহোদর ভাই—মৃত্যু।

আবার ভুল করে। কাঁপা, কুণ্ঠিত গলায় বলে—তুমি কে ?

মনে মনে বলি, হয়তো তোমার ছেলেবেলাকার মণ্টুদাই। আমি নিজেকেই হয়তো ভুলে গেছি, চিনতে পারছি না।

সন্ধ্যাবেলায় অরুণ হাঁকে—গাড়ি হাঁকাও জলদি। পৌনে আটটার মধ্যে পৌঁছে দিতে পারলে বকশিশ একটাকা।—ব'লে একটাকা ওয়েস্ট-কোটের পকেট থেকে বার ক'রে ছুঁড়ে দিলে আমার দিকে। টাকাটা গড়িয়ে প'ড়ে গেল পথে। কুড়িয়ে নিতে কেয়ার করি না। যেন একটা মুসাফির ভিক্ষুক ঐ টাকাটা পায়—গরুর গলার ঘণ্টা যেন এই কথাই বলতে বলতে চলে। বলে—ঘরে ফিরে চল ভাই—

সাহেবি ক্লাবের সমুখে গাড়ি দাঁড়ায়! অরুণ নেমে বলে—বারোটার সময় নিয়ে এস গাড়ি।

বারোটার সময় গাড়ি নিয়ে যাই। কোনো কোনো দিন ভোরবেলাতেই বাবুর বারোটা বাজে।

সুন্দরকে বললাম—আজ তোমার পালা, ভাই।

সুন্দর গাড়ির মধ্যে বিছানা পেতে পা ছড়িয়ে ব'সে গরুর ল্যাজ ম'লে দেয়। রুমুঠুমু ঘণ্টা বাজিয়ে ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে গাড়ি চলে ঘুম পাড়িয়ে পাড়িয়ে! কখন মুক্তার ঘরের আলো নিভে গেল, টের পাই। নিশুতি রাতের স্তিমিত অন্ধকারে খালি একটি মুখ মনে পড়ে—তার একটা চোখ কানা, ঐ ক্ষীণ পাংশু চাঁদের টুকরোটার মতো! তার মুখে সংখ্যাতীত বসন্তের দাগ—যেন নক্ষত্রখচিত কুৎসিত ঐ আকাশটা!

সুন্দরের কাঁধ জড়িয়ে টলতে টলতে অরুণ এল—রাত আঁধিয়ারা। সুন্দরই ঘর পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এল যা হোক।

এসে বললে—ভীষণ গিলেছে আজ। নাও, বিছানাটা পাত শিগগির। বাবা—

ব'লেই চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা চিৎকারের চাকু অন্ধকারকে যেন চিরে গেল। এগোলাম। দরজাটা দু'ফাঁক। দুরন্ত দস্যুর মতো দখিন হাওয়া ঘরের মধ্যে লুটের লাট্টু ঘুরিয়ে দিয়েছে। ল্যাম্পটা চৌচির হয়ে মেঝের উপর ফাটা, কাদাটে চাঁদের আলোয় চিকমিক করছে।

আবার প্রশ্ন এল—কে?

দেশলাই জ্বালালাম। খাটের উপর অরুণ শোয়া—গোঙাচ্ছে। আমাকে দেখে মুক্তা সোফা থেকে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে বললে—কি চাও ?

বললাম—আপনার ভুরুর ওপর থেকে কেটে গিয়ে রক্ত গলছে, জায়গাটা বেঁধে ফেলুন।

ও একটা পাখা নিয়ে অরুণকে হাওয়া করতে করতে বললে—তোমার তাতে কি ?

—পাখা পরে করলেও চলবে, কিন্তু কোথায় আইডিন আছে বলুন, বেঁধে দিই।

ও পাখাটা দিয়ে দরজা দেখিয়ে বললে—কে তোমাকে মাথা ঘামাতে বলেছে ? যাও এখান থেকে—ব'লে ফের পাখা চালাতে লাগল। অরুণের চুলে আঙুলও বুলোতে লাগল খানিক।

মদ খেলে দাদাবাবুকে দেখাত গরিব, দুঃখী—যেন বুকের ভিতরটা ফাঁকা, খাঁ খাঁ করছে। আর একে দেখাচ্ছে—বীভৎস, বিকট। কিন্তু, কে জানে ? হয়তো ওরও মনের মরুতে মেঘের মমতা মাখা নেই, হয়তো ও-ও একলা, পিয়াসী !

বললাম—তাই যদি হয়, তবে শুধু ঐ টুকুন পাখা-চালানোয় কি হবে ? যে মদ খায়, তাকে আরো ভালোবাসুন, ভাসিয়ে নিয়ে যান। সব চেয়ে ভালোবাসার দরকার তারই যার কান্না শুকিয়ে গেছে—

ও পাখাটা আস্তে আস্তে পাশে রেখে সোফাটার উপর ব'সে পড়ল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে—যেন বিষাদে ভরা, গোধূলিতে মন্থরচারী গরুর গলার ঘণ্টার মতো উদাস। যেন বলছে—ফুরিয়ে গেছে, মণ্টুদা।

ওর ঘা-টা আস্তে আস্তে বেঁধে দিলাম।

বললাম—ওখানে মেঝের ওপর বিছানা পেতে দিই। এবার ঘুমোন।

ও শুধু বললে—দাও। পুবের জানালার ধারে, নিচেরটাও খুলে দিয়ো।
বিছানা পেতে দিলাম।
বললে—ঐ লাল-বইটা বালিশের তলায় রাখ, আর এই নীলটা পাশে।
আর বাকিগুলো চারপাশে ছড়িয়ে দাও—এলোমেলো ক'রে। তুমি—
দরজাটা ভেজিয়ে বেরিয়ে যাই। মাঠের মধ্যে গিয়ে দূর থেকে ম্লান জ্যোৎস্নালোকে দেখি, বিছানা শূন্য—এখনো শুতে আসেনি। কি করছে মুক্তা ? হয়তো অরুণের পাশে ব'সে পাখাই চালাচ্ছে সারারাত।

অরুণ পেণ্টালুনের পকেট হাতড়ে একটা চাবি বার ক'রে মুক্তাকে বললে —ক্যাশব্যাক্সের চাবিটা রাখ। ওর মধ্যে প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা রইল তোমার এ-ক'দিনের খরচের জন্য। এবার অনেকগুলি রুপোর চাকতি হাতড়ানো গেছে। এবার অন্তত একটা খোকা-মোটরকার কিনতেই হবে।
মুক্তা শুধু বললে—এবার কি ফিরে আসতে খুব দেরি হবে ?
—হয়তো হবে একটু। দরকার হলেই আমাকে তার করবে, আমি যেখানেই যাই তোমাকে জানাব। তুমি কলকাতায় বিজনকেও লিখতে পার, সে না-হয় ক্লাইভ ষ্ট্রীটে চাকরির জন্য কপাল কুটে-কুটে না হায়রান হয়ে এখানে দিন কতক ব'সে ব'সে গিলে চেহারার ভোল ফিরিয়ে নিক। যদি ইচ্ছে হয়, ওর সঙ্গে কলকাতায় ফিরেও যেতে পার।—যা তোমার খুশি।
ব'লে ছুটে নেমে গাড়িটায় এসে বসল। গরু দুটোর ল্যাজ ম'লে দিলাম।
মুক্তা নীল-বইটা হাতে নিয়ে একান্ত মনোযোগে পড়ছে। একবার

তাকিয়েও দেখলে না। ও যেন একটা ফুরোনো ফোয়ারা—উজাড়-করা উদ্‌লা একটা ঘট।

যেতে যেতে প্রশ্ন করলাম—কোথায় যাচ্ছেন?

—দিল্লি।

—উদ্দেশ্য?

—ব্যবসা। সেখান থেকে আগ্রায় যাব, তাজ দেখতে। এবার দেখব অমাবস্যায়—

গরুর গলার করুণ ঘণ্টার কাতর কাকুতি শুনে আপন মনেই বলে—অন্ধকারে পাষাণের পুঞ্জিত দীর্ঘশ্বাস শুনব। তারপর রাজপুতনার ওপর দিয়ে ছুটে যাব—লু-র মতো—

—কবে ফিরবেন?

—ফিরব? ড্যাম্‌। হাঁ, ফিরতে হবে বৈকি। যখন ডানা বুজে আসবে, ঘুম পাবে যখন।

মরা, নিশুতি রাত, ঘুমন্ত মনের সঙ্গে আকাশের তারা কানে কানে কথা কয়, স্বপ্নের সুরে। যেন কি অকূল চেনাচিনি, চোখের জলের সঙ্গে চাঁদের, ভালোবাসার সঙ্গে অন্ধকারের!

কথা কইতে না-পারার সঙ্গে এই ব্যর্থ বিস্তীর্ণ বিদীর্ণ শূন্যতার।

পা টিপে-টিপে শিয়রের কাছের চেয়ারটায় বসলাম।

আবার সেই সুগভীর অতল জিজ্ঞাসা—কে তুমি?

—আমি।

মুক্তার নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। থেমে বললে—তুমি পুরুষ?

চেয়ারের হাতলটা মুঠির মধ্যে সজোরে চেপে ধ'রে বললাম—হাঁ।

—ও!—একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—কুৎসিত, বিচ্ছিরি, ভেজাল। আর আমি কে, জান?

—তুমি মুক্তা। তাই তো তোমাকে জানিনা!

—আচ্ছা, তোমার সঙ্গে মণ্টুদার কোনোদিন দেখা হবে? তুমি তো পায়ে পায়েই নাকি পাড়ি দেবে এ-পৃথিবী। যদি দেখা হয়—আমার কিছু ভালো ক'রে মনেও নেই। তেরো বছরের আগেকার একটি দশ বছরের দুষ্টু ছেলে, তার জামার ওপর খুদে কাপড়টি বাঁধা, তার লাল পাড়টা আমার কপালের সিঁদুরের মতোই ডগডগে—এখনো মনে পড়ে। আর মনে পড়ে সেই আমের শাখায় দোলনা, দোলায় দোলায় বউল ঝ'রে পড়ত। তাকে তো ভুলেই ছিলাম, তার ভালো নামও মনে নেই। হঠাৎ—

—যেদিন তোমার ঘোমটা খুলে গেল, সেদিন। যেদিন আকাশের তারা মাটির বাতি হয়ে বাদলা-পোকার পাখা পোড়াতে লাগল। দেখা হলে কি বলব তাকে?

—কীই বা বলবে? ব'লো—

—তার চেয়ে কলকাতার বিজনকে তার করি। সে আসুক, তোমাকে নিয়ে যাক। তোমার স্বামী এখন কোথায়, জান?

—নাইনিতাল।

—তাঁকেই তার করি।

—দরকার নেই। একা মরতে আমার কষ্ট হবেনা। মরণও ভারি একা—

অরুণ একদিন একেবারে হুড়মুড় ক'রে এসে পড়ল—রাজ্যশুদ্ধ যত ডাক্তার

কবরেজ হাতুড়ে ওঝা নিয়ে—এক এলাহি ব্যাপার। এক রাতেই ওর যত বাক্স ছিল, সব হাঁ হয়ে গেল।

মুক্তা নিশ্বাস ফেলে বললে—মুক্তি!

সেই থেকেই মুক্তার মেয়ের নাম—মুক্তি।

অরুণের সেদিনকার উন্মত্ততা বিধাতার জানা আছে—যেদিন এ-কন্যা পৃথিবী জন্ম নিয়েছিল।

দুদিন বাদেই আবার তল্পিতল্পা বাঁধলে। আবার অনেকগুলি টাকা জিম্মা রাখলে, চাবি দিলে, আরো একটা ঝি বাহাল করলে, একটা নার্সও। খুব সাবধানে থাকতে বললে, বললে—এবার ইচ্ছা হলে বিজনকে চিঠি লিখো, তোমাকে যেন নিয়ে যায়।

বললাম—কোথায় যাচ্ছেন এবার?

—দক্ষিণে। এর পর জলের ওপর পাল তুলে দেব ভাবছি—লোনা জলের।

সেদিন মুক্তা আমাকে বলছিল—ওর নাম মুক্তি। ও আমাদের মুক্তি দিলে, —ভালোবাসার ভার থেকে।

নার্স ই মেয়েটাকে নাড়ে চাড়ে, নাওয়ায় খাওয়ায়, ঝাড়ে পোঁছে। ও ওর সেই নীল-বইটা কোলের উপর চেপে চুপ ক'রে চেয়ে থাকে। আর, কথার অতীত স্বর শোনে। মেয়েটাকে ছুঁতেও যেন ওর ঘেন্না হয়—এমনি।

ভালোবাসার মতো রাত নেমে এসেছে—ভালোবাসার মতোই বৃষ্টি।

হাওয়ায় যেন কে শুধোল—তুমি জেগে আছ?

—হাঁ, আছি বৈ কি।

অবাক হয়ে তাকালাম—সামনে মুক্তা। বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে ভিজছে—চোখের পাতায়, ঠোঁটে, ললাটে বৃষ্টিবিন্দু, গলার স্বরও যেন বৃষ্টিতে ভেজা।

বললে—গাড়িটা ঠিক করো।

—কোথায় যাবে? এত রাতে, বৃষ্টিতে?

—যেখানে তোমার খুশি, নিয়ে চল।

ওকে ভারি একা, শীর্ণ, পাণ্ডুর দেখাচ্ছে।

বললাম—খুকি?

—ও তো মুক্তি!

গাড়িটায় চাপল।

বললাম—তোমার গায়ে যে জড়াবার একটা চাদরও নেই।

—কোনো দরকার নেই। তুমি যে বাইরে ব'সে ব'সে খালি ভিজবে।

—তাতে কি? চারদিকের ঝাঁপগুলো বন্ধ ক'রে দিই?

দিলাম।

সমানতালে বৃষ্টি চলেছে, তার সঙ্গে গরুর গলার ঘণ্টা—করুণ কান্নায় ভরা।

চরাচরব্যাপী অন্ধকার—এও ভালোবাসারই মতো!

সামনে একটা নিচু মাঠ, জলে থৈথৈ করছে।

বললাম—সামনে যে জল!

ও ভারী গলায় বললে—জলের ওপর দিয়েই চল।

বৃষ্টিতে স্নান করছি—ভালোবাসায়ই। জলের নূপুর বেজে চলেছে—

ও বললে—গাড়িটা থামল যে?

—গরু চলতে চাইছে না। আর কতদূর যাবে? এবার ফের।

—ফিরতে হলে তুমি ফের। লাগামটা আমার হাতে দাও!

নিজের গায়ের কম্বলটা চিপে কাজলার উপর চাপিয়ে দিলাম, খানিক বাদে আবার শ্যামলার উপর চাপাই।

অবোলা গরু দুটো নিজের গলার ঘণ্টা শুনতে শুনতে চলে, জিরিয়ে জিরিয়ে।

মাঠ পেরিয়ে আবার পথ পেয়েছি। কিন্তু অচেনা। কোথায় চলেছি, কেউ জানিনা।

আবার বলি—হয়তো খুকি জেগে উঠে তোমার জন্যে কাঁদছে। এবার গাড়িটা ফেরাই।

ও কিছু বলে না। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

বৃষ্টির বিরাম নেই—একটু ধরে আবার দমকে দমকে আসে—সমস্ত আকাশ যেন ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

গাড়িও চলে—এবড়ো পথ, থেমে থেমে, ঘুমিয়ে। ঘন অন্ধকার, মাঠ বাট সব মুছে গেছে—

বলি—আর আমাকে কতদূর নিয়ে যাবে?

কোনো জবাব নেই—চারদিকের ঝাঁপ বন্ধ। খুলতে হাত ওঠে না। লাগামটা ছেড়ে দিয়ে হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে পড়ে থাকি—বৃষ্টির ঝাপটায় সমস্ত শরীর ক্লান্ত, অবশ হয়ে এসেছে।

হঠাৎ একটা উঁচু পাথরের ঢিবির সঙ্গে গাড়ির চাকার ধাক্কা লেগে গাড়িটা কাত হয়ে পড়ল।

চমকে লাফিয়ে প'ড়ে চেঁচিয়ে উঠলাম—মুক্তা!

ঝাঁপ খুলে দিলাম।—মুক্তা গাড়ির মধ্যে নেই।

সামনে পিছনে চারপাশে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, আঠার মতো। গলা টিপে ধরছে। গরু দুটো মুখ থুবড়ে প'ড়ে শীতে কাঁপছে।

চেঁচিয়ে, অন্ধকার টুকরো টুকরো ক'রে চিরে ফেলে ডাকতে ইচ্ছে করছে—মুক্তা, মুক্তি! কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না।

হয়তো ও গাড়ি থেকে কখন নেমে বাড়িই ফিরে গেছে। হয়তো ও ওর মেয়েরই ডাক শুনেছে—এই চপল বৃষ্টির উছল কলতান শুনে—গরুর গলার উদাস ঘণ্টারব শুনে—
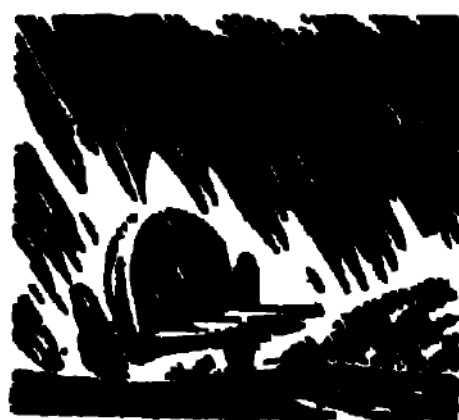
বনজ্যোৎস্না

বেকার হয়ে পথে বেরিয়েছি, যেন কোথায় কবে কারবার করেছিলাম, ফতুর হয়ে গেছি।

একটা মেসে এসে দেখি—বিকাশ! একেবারে বদলে গেছে, কি রকম রুক্ষ চোয়াড়ে হয়ে গেছে, চোখে নিষ্ঠুর অবিশ্বাস। হাত দুটো ধ'রে বললে—খুব ঘুরতে বেরিয়েছিলি যা হোক, একটা খবর নেই। পায়ে কতগুলি কাঁটা ফুটল?

চাকরি করে। বিয়ে করেনি।

বললাম—তোর মাইনেতে আপাতত কিছু ভাগ বসাব। যদ্দিন না একটা কিছু জোটে—

মেসে নানা রকমের জন্তু ভিড়েছে আগে থেকেই। তবে ভয় নেই।

বিনোদের আর যাই থাক, একখানা গলা ছিল। যেমন জোরালো তেমনি খোনা। তিন রকম আওয়াজ বেরুত—হেঁড়ে, হাপুরে, আর খনখনে। কিন্তু খুব সকালবেলা, অন্ধকার তখনো ডুবে উবে যায় না, যখন বালিশের থেকে মুখ বার ক'রে ব'লে উঠে—সাত ভাই চম্পা জাগ রে—

আর যখন ঘুমন্ত কারুরই কোনো সাড়া না পেয়ে হঠাৎ গলার স্বরটা খাদে নামিয়ে ধীরে উচ্চারণ করে—কেন বোন পারুল ডাক রে—
মনে হয় অপরূপ, অপরিচিত সে-কণ্ঠস্বর।
শুনি, আর মনে হয়, যেন ভোরের তারা যাবার আগে ভোরের আলোর কানে-কানে কি কথা কয়ে যাচ্ছে।
রোজ।

খুব মনে পড়ে সেদিনটা। বিকাশের পিছুপিছু যে-লোকটা মাথা খাড়া ক'রে আসতে গিয়ে চিপা দরজার চৌকাঠে বিরাট একটা ঢুঁ খেয়ে টুঁ-টি না ক'রে বেকুবের মতো ঘরে এসে ঢুকল—সেদিন তার অনেক কিছু দেখেই আশ্চর্য হওয়া যেত হয়তো—কিন্তু আমি দেখেছিলাম তার নাকের উপর ত্রিশূলের মতো কাটার দাগ একটা—আর তার দুপাশে দুই চোখের আর্দ্র ও অবসন্ন বিষণ্ণতা!
অখিলবাবু গাড়ুতে সবে জল ভরছিলেন—সন্ন্যাসী দেখেই সেই জলে চোখ দুটো তাড়াতাড়ি কচলে নিয়ে ছুটে এসে বললেন—পেন্নাম, সন্নেসী ঠাকুর। কি মনে ক'রে এই গরিবদের আস্তানায়?
বিকাশ বললে—আস্তাবলে বলুন, অখিলদা!
অখিলবাবু যদ্দুর পারেন ঠোঁট দুটো প্রাণপণে টেনে দাঁত বত্রিশটা দেখিয়ে বললেন—হঠাৎ পায়ের ধুলো পড়ল?—
বিকাশ বললে—আপনাদের আপিসে যদি একে একটা ভাঁওতা ক'রে ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তো বেচারার একটা হিল্লে হয়। একটা নাপিত ডাকি বিনোদ, দাড়িগুলি কামা!

অখিলবাবু কথায় কোনো কান না পেতেই যেতে যেতে বললেন—আমি এখুনি আসছি, ঠাকুর। গরিবের হাতটা একবার দেখে দিতে হবে।

বললাম—কোথা পেলি বাবাজীকে ?

—এক মন্দ ফিকির করেনি ভাই—বিকাশ বললে—মাস দুয়েক কষ্ট সয়ে চুল আর দাড়িগুলি দিব্যি গজিয়ে ফেলেছে, ব্যবসা ফ্যালাও-এর দিব্যি ক্যাপিটাল। তুই তো পুরো ছ'টা মাস পা-টমটমে টো টো ক'রেও কোনো আপিসে একটা ঠোকর পর্যন্ত মারতে পারলি না। ও বেড়ে এক গোছা দাড়ি বাগিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একেবারে পাগলা ঘোড়ার মতো হাত পা ছুঁড়ে চেঁচাতে শুরু করলে। ভিক্ষাও না, বক্তৃতাও না—একটা ইংরিজি কবিতার আবৃত্তি। নারকেলহীন নারকেলডাঙার গোবর-গণেশরা এই নাগা সন্নেসীর অদ্ভুত প্যাঁচে একেবারে বে-কায়দা হয়ে পড়েছে দেখলাম। ভিড় সরিয়ে দেখি—আরে বিনদা না ?

—চিনতে পারলি ?

—ঐ আধখানা কানটা দেখেই চিনে ফেললাম। তুই তখনো আসিসনি। ইস্কুলে পড়াতে পড়াতে রামহরি মাস্টারের মুখ দিয়ে নাল গড়াত। তাই দেখে আমি আর বিনদা জোট বেঁধে বেঞ্চির তলা দিয়ে বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে চেঁচিয়েই ব'লে ফেলেছিলাম—ও বুড়ো, হুতুম-খুড়ো, লবেনচুস খাবি ? হাবলা বুড়ো তো চটে মটে একাকার হয়ে সামনের ছমু মুদির দোকান থেকে দুটো তালপাতার বড় বড় ঠোঙা নিয়ে এসে গাধার টুপি বানিয়ে আমাদের মাথায় চাপিয়ে দিলে। মাথা দুটো দোহাত্তা ঠুকে দিয়ে টুলে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললে—কান মল দুজনেরটা, জোরসে! পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে সে কী কানমলা ভাই—কাছি-টানাটানি। বিনদার ছিল বেড়ালের মতো নোখ, রক্ত বার ক'রে ছাড়লে। আমি

একেবারে ক্ষেপে গিয়ে খপাস ক'রে ওর কানে কামড় বসিয়ে দিলাম, আধখানা মুখের মধ্যে বেমালুম চলে এল। তাইতেই। এখন ঐ কাটা কানটা মনে হচ্ছে যেন নেংটি ইঁদুরের ছা।

বিনোদ খোনা গলায় বললে—খিদের খোরাকের জন্যেই এই ফিকির নয়, ভাই। যেমন গৌতম—

জিভ উলটে বিকাশ বললে—থাক! গৌতম নয়, গো-তম—গরুশ্রেষ্ঠ।

বললাম—ঐ অখিলবাবু এসে পড়ছেন—

বিকাশ বললে আস্তে আস্তে—হাত পাতলেই এক নিশ্বাসে ব'লে যাবি বিনদা—তৃতীয় পক্ষ আপনার, আগে নাম ছিল গজেন্দ্রবালা, বদলে রেখেছেন গজমোতি—প্রথম পক্ষে সাতটি, দ্বিতীয় কোঠায় চারটি, আর তিন নম্বরে আধখানা।

—তার মানে?

—তার মানে যমজ হয়েছিল, একটা পটল তুলেছে। বলিস, আপনিই পাশ ফিরতে গিয়ে ভুঁড়ির তলায় ফেলে চেপটে দিয়েছিলেন।

—আর?

—বলিস, আপনি সাড়ে চৌত্রিশ টাকায় পাটের গুদামে পাটের বস্তা গুণে দিন কাটান, খান থাকি সিগারেট, শোন গামছা প'রে, দুমাস বাদে আপনার আট আনা মাইনে বাড়বে। ভুঁড়িটি ভোম্বল হলেও ভোগেন অম্বলে, সেদিন বিকাশের পাল্লায় বায়স্কোপে গিয়ে শেষ হবার জায়গায় সিটি মেরেছিলেন, রবিবার সকালবেলা ঘুষি মারলেও আপনার ঘুম ভাঙে না—কেরানীর ঘুম।

বলতে বলতে বিনোদ বেফাঁস ব'লে ফেললে—আপনার তৃতীয় পক্ষটিও টিকলে হয়!

—বলেন কি মশাই ?—অখিলবাবু কিল খেয়ে আঁতকে উঠলেন যেন !

সামলে নিয়ে বিনোদ বললে—তবে চতুর্থ পক্ষ আপনার বাঁধা একেবারে। চেলি প'রে জ্বল জ্বল করছে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেনঅখিলবাবু—যাক, দমটা ফিরে পেলাম। কোনো বিঘ্ন হবে না তো বাবাজী ?

—কিঞ্চিৎ। তা, টাক আপনার বেশ টনকো আছে।

বললাম—তা হলে এখন থেকেই জীইয়ে তোয়াজে রাখুন অখিলবাবু।

বিকাশ বললে—আমার জিম্মাতেও রাখতে পারেন—

বিনোদ গায়ের আলখাল্লাটা খুলে ফেললে। আমাদের পুরনো হোঁচট-খাওয়া মুখ-থুবড়ে-পড়া মেসটা যেন হঠাৎ কথা কয়ে উঠল।—যেন মিতা মিলেছে।

এতদিন কোথায় যেন একটা ফাঁক ছিল। একটা পা যেন ছিল না—যেন ঠেকো দিয়ে ছিল এতদিন—সহসা সব ভরাট হয়ে উঠেছে। কবিতার চমৎকার মিল একটা।

একটা জীর্ণ থুথ্‌ড়ো বুড়ো বাড়ির সঙ্গে যে একটা জ্যান্ত মানুষের এমন সামঞ্জস্য থাকতে পারে, ভাবিনি। যে ছেঁড়া আলখাল্লাটা ও ছেড়ে ছুঁড়ে ফেললে, তার রঙ এককালে গেরুয়া ছিল, এখন তা ম'রে ম'রে মেটে কাদাটে হয়ে এসেছে—সেই আলখাল্লাটার সঙ্গে পর্যন্ত।

বুকের একটা দিক একেবারে চাপা, বসা, যেন একটা ফুসফুস কে চুষে নিয়েছে। নাকটা থেঁতলানো, কানের আধখানা খোয়া গেছে, গলাটা হাড়গিলের মতো. মাথায় বাবুইপাখি বাসা বেঁধেছে বুঝি।

কিন্তু এই কুৎসিত হতচ্ছাড়া দেহটার আবরণ উন্মোচন করার নির্লজ্জতার মধ্যে যেন সুদূর একটি ব্যথা আছে।

শ্যাওলা-পড়া দেয়াল ফুঁড়ে বটের চারা বেরিয়েছে—ওরা ওকে সম্ভাষণ জানায়। ফাটা ইটগুলি ওর ভাঙা পাঁজরার পানে চেয়ে থাকে।

দাঁত-বের-করা রাস্তা—পায়ে খোয়া শুধু ফোটে না, কামড়ায়। মনে হয় ওর মেজাজ যেন সব সময়েই খিটখিটে। রোগা পটকা গলি, কেশে-কেশে যেন ধুঁকছে, এমনি মনে হয়।—তালপাতার সেপাই।

পাশেই বুড়ো বাড়িটা জুজুবুড়ির মতো ঘুপটি মেরে ব'সে—যেন ফোকলা দাঁতে হাসছে।

বাড়ি আর রাস্তা—দুই ভাই বোন যেন। সমবয়সী। শীতের হাওয়ায় জবুথবু হয়ে ব'সে আপন মনে খোশগল্প করে।

নিচের তলায় এক খোপরিতে কিনু-উড়ে বাদামী তেলে ফুলুরি ভাজে, কপাল বেয়ে টসটস ক'রে ঘাম ঝরে কড়ার উপর, আরেকটাতে রাখহরিরা আগুনে টিন তাতিয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেটায় সারাদিন, তৃতীয়টায় এক বুড়ো কবরেজ—দিন প্রায় কাবার ক'রে এনেছে—মাটির উপর ময়লা চাদর বিছিয়ে শুয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে, বার্ধক্য ওকে শুষে-শুষে একেবারে আমসি ক'রে ফেলেছে। রাস্তার যে-লোক ভুল ক'রে এই কাঁকড়ার মতো বুড়োর দিকে একবার তাকায়, তাকেই ও ডাকে। বলে—কেন শুধু শুধু পিত্তশূলে ভুগছ সোনার চাঁদ, সাড়ে চার আনা পয়সা দিয়ে এক হপ্তার বড়ি নিয়ে যাও, অনুপান শুধু দুটো উচ্ছেপাতা।

এই বুড়োর মুখে যেন এই বোবা বন্দী ব্যাজার গলিটার কাতর কাকুতি!

পকেটে দশটা পয়সা। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম—ছেলে-পড়ানো

থেকে বাজার-করা তক এমনি একজন বেকার চেয়েছে। আপিস-খাম আর টিকিট কিনতে হবে। আর, জামা কাপড়ের এমন ছিরি হয়েছে যে, একটা মেটে সাবান না হলেই নয়, জামার বোতামগুলো ছেঁড়া, কিছু আলপিন-এরও দরকার।—মনে মনে দশ পয়সার হিসেব কষি।

গ্যাসপোস্টে, এখানে সেখানে তাকিয়ে তাকিয়ে চলি, যদি একটা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। যদিও কালে-ভদ্রে দু'একটা পড়ে—তার আর ঠিকানা খুঁজে পাই না, কে আগেভাগেই লুফে নিয়েছে। লটপটে চটি দুটো টেনে টেনে পথ ভাঙি। একটা বড় বাড়ির দরজার সামনে ভোরবেলাই অজস্র লোকের ভিড়। জিগগেস করি—ব্যাপার কি এখানে?

একজন বলে—সকালের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে, জুতোর দোকানের এক বিক্রিদার চাই। চৌদ্দ ঘণ্টা ফাটক—চৌদ্দ টাকা মাইনে। ভিড় জুটেছে প্রায় চুয়াল্লিশ। বাবু এখনো নামেননি ব'লে দরোয়ান দরজা খুলছে না। দেখছেন কি রকম ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে!

সবার পিছনে দাঁড়িয়ে লোকটি করুণ ক'রে একটু হাসে—হাতের কাগজটা মোচড়ায়—অথচ ফিরে যায় না।

চলি। মোড়ের মুচিটা ছেড়া হাঁ-করা চটিজুতোর পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—মাছের উপর বেড়ালের দৃষ্টির মতো; গাড়ির আড্ডার গাড়োয়ান ডেকে জিগ্‌গেস করে—কোথায় যেতে হবে? ডিসপেনসারিতে ব'সে নতুন নবডঙ্গ ডাক্তার আমার দিকে চেয়ে ভাবে—আমাকে দিয়েই বুঝি ওর বউনি হবে আজ, যদি নাড়ীটা দয়া ক'রে ওকে দেখাই! বেশ একটু সচেতন হয়ে ওঠে। ভিখারী ভিক্ষা চায়, ভিক্ষা না-দিলেও আশীর্বাদ করে—মাগনা।

গঙ্গা ব'লে ডাকতে দুঃখ হয়—একটা বড় নর্দমা! পারে অতিকায়

কারখানা একটা—যেন হিক্কা উঠেছে। ফুসফুসটা এই ফাটল ব'লে।—
সপাসপ ঢুকে গেলাম, বললাম—সাহেবের ঘর কোনটা ?
শিরদাঁড়াটা খাড়া ক'রে সাহেবের ঘরে ঢুকে সেলাম না-ঠুকেই বললাম—
একটা চাকরি দাও।
গুণপনা কি, জিগগেস করায় বললাম যে, চৌকো একটা লেফাফায় চওড়া
একটা কাগজ আর এই চওড়া বুকটা।
বি-এ পাশ-কে কলের কুলিগিরিতে বহাল করতে পারে না—সাহেব
বললে।
বললাম—ড্যাম। দেখ এই ড্যানাটা।
জামার হাতাটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে মজবুত বাহুটা ওকে দেখাই।
কিছুই হয় না। সাহেব দরজা দেখিয়ে দেয়। এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে পেটুক
কারখানাটা দেখি—বেশ লাগে। ওর কবিতায় নিজের হাতে হাতুড়ি ঠুকে-
ঠুকে ছন্দ মেলাতে ইচ্ছে করে।
দুটো লোক করাত দিয়ে একটা লোহার 'বিম' কাটছে। বলি—কতক্ষণে
ফুরোবে ?
—ঘণ্টা আষ্টেক তো বটেই—সেই কখন থেকে বসেছি। ড্যানা দুটো
ছিঁড়বে এবার।
আবার গঙ্গার পার বেয়ে হাঁটি। ওর টুঁটি সহস্র মুঠিতে কারা টিপে ধরেছে,
—বাতাসের জন্যে হাঁপানি রোগীর মতো গলা বাড়িয়ে রয়েছে যেন। ঐ
দুটো অসহায় মজুরের কথা ভাবি—আর কতক্ষণ করাত চালাবে ওরা ?

ছবির নিচে নাম লেখা তিলোত্তমা, বাজানই বা না কেন ডুগি-তবলা, দেবী

তো বটেন। অখিলবাবু তাই যত্ন ক'রে মাথার পাশে টাঙিয়ে রেখেছেন। বিকাশের ঘর থেকে আধপোড়া সিগরেটের টুকরোগুলি কুড়িয়ে এনে পিন ফুটিয়ে ফুটিয়ে খান, খুকি-বউয়ের জন্যে স্প্রিং-এর নাগরদোলা থেকে শুরু ক'রে মৃগীরোগের ওষুধ কেনেন লুকিয়ে লুকিয়ে। আগে আগে গাড়োয়ানি ইয়ার্কিতে ভরা এক পয়সার চোথা কাগজ কিনে সপ্তাহ ভ'রে তাই তুইয়ে তুইয়ে পড়তেন। এগুলো দিয়ে ঠোঙা হবে না, দাম এর আধলার আধপয়সা বেশি নয়—কাগজওলা এই কথা বলাতে আর কাগজ কেনেন না। এতদিন ধ'রে যা পুঁজি ক'রে রেখেছিলেন, পুঁটলি বেঁধে বাড়ি নিয়ে গেলেন এক সময়, শেষ আধখানা বাচ্ছাটার দুধ গরম হবে। এখন আপিস থেকে এসে ভেজা গামছা বুকের উপর ফেলে ছাতের ধারে বিনোদের মুখে দেশ-বিদেশের গল্প শোনেন।

তাই জানতাম।

সেদিন বিকাশ গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—গল্প শুনে যা কাঞ্চন, বিনোদ-বাবাজীর আসনাইর কেচ্ছা।

এক পাশে শুয়ে পড়লাম। বিকাশ বললে—আপনার ভুঁড়িটি একটু এগিয়ে দিন অখিলদা, তাকিয়া করি। তাকিয়ায় ঠেস না-দিয়ে কি প্রেমের গল্প শোনা যায়, না সহ্য হয়?

একদিকে বিকাশের হাসি, যেমন প্রচণ্ড, তেমনি নিষ্ঠুর তবুও, অন্যদিকে বিনোদের সেই উদাসীন উচাটন কণ্ঠস্বর—হোক না হেঁড়ে, হোক না স্যাঁতসেঁতে, কিন্তু করুণ, মন্থর—যেন সমস্ত ঠাট্টাকেই উপেক্ষা করছে।

বিকাশ বলবে, অখিলদা ঝিমুচ্ছেন, কিন্তু এ তাঁর তন্ময়তা, যেমন তন্ময়তা এই ধ্বসে-পড়া অন্ধকার নিসাড় বাড়িটার।

বিনোদ একমনে নিজের দাড়ি হাতায়, আর কোনো কুণ্ঠা না ক'রেই

ব'লে চলে খোনা গলায় অথচ আস্তে — সে কি রোদ ভাই, চোখে কান্না জড়িয়ে আসে। বড় ইষ্টিশান থেকে আট ক্রোশ দূরে আমার সেই পারুল-ফোটার গাঁ। চলি-চলি আর তার সজল সস্নেহ চোখ দুটি ভাবি—আর দুপুরের রোদ যেন জুড়িয়ে আসে। সমস্ত দেহ অবশ—অথচ ক্লান্তির মধ্যে এমন একটি শান্তি। সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সন্ধ্যা ডানা মেলেছে—তখন পৌঁছুলাম।

বিকাশ বললে—তারপর তো ঘরে ঢোকা মাত্রই পারুলের বাপ ঠ্যাঙা উঁচিয়ে তেড়ে এসে তোকে তাড়িয়ে দিলেন, তুই উলটে একটা চড়ও মারতে পারলি না, না? কি করলি তখন?

—প্রকাণ্ড অশ্বত্থের তলায় পারুল আমারই জন্যে ছায়া মেলে রেখেছে। দেখা কি এত সহজেই মেলে? আমারই জন্যে পারুল পাঠিয়ে দিলে বাতাসের স্নেহস্পর্শ—আমারই জন্যে জ্বালিয়ে রাখল সন্ধ্যার প্রথম তারাটি!

বিকাশ বললে—তারপর গাছতলায় শুয়ে ভেউ-ভেউ ক'রে খুব খানিকটা কাঁদলি—যেমন পরীক্ষায় ফেল ক'রে কেঁদেছিলি বোকার মতো? ট্যাঁকে যা পয়সা ছিল, তা দিয়ে আফিং বা কার্বলিক অ্যাসিড কেনবার মতো মুরোদ ছিল না ব'লেই বুঝি কতগুলো শুকনো চিঁড়ে ও নারকেলের মালায় ক'রে খানিকটা ঝোলা গুড় কিনে এনে চিবোতে বসলি? যা খিদে পেয়েছিল! নয় কি? কি বলিস রে, কাঞ্চন?

অখিলবাবু রুখে বললেন—সব সময় ইয়ার্কি ক'রো না, বিকাশ। আমার বেড়ে লাগছে শুনতে।

বিনোদ এবার যেন অখিলবাবুকেই লক্ষ্য ক'রে ক'রে বলতে লাগল—সন্ধ্যায় যখন বিদায় নিয়ে যেতাম, পারুল বিষাদিতা গোধূলি-বেলাটিরই মতো ছাদে এসে দাঁড়াত।

বিকাশ বললে—শুকোতে দেওয়া কাপড়-জামাগুলি ঘরে নিয়ে যেতে। তোরই জন্যে নয় রে, হতভাগা।

—ওর চারধারে এমন একটি পবিত্র বৈরাগ্য!

—সেদিন নিশ্চয়ই ওর জ্বর-ভাব ছিল, কিছু খায়নি, মুখ শুকনো, গা শিথিল, পরনের কাপড় ময়লা—তাই সেটাকে বৈরাগ্য ব'লে ভুল করেছিলি। বোকা!

হঠাৎ বিকাশ প্রশ্ন করলে—যাক। বেচারীর নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেছে তো? কটি ছেলেপুলে হল?

বিনোদ বললে—সে চিরকুমারী। আমারই জন্যে দুঃখের তপস্যা করছে।

—মৃগীরোগ আছে বুঝি? বাপ বুঝি বিয়ে দিচ্ছে না? তাই?

—আমাদের মিলন দেহকে ডিঙিয়ে—

—যেমন লঙ্কা ডিঙিয়েই অযোধ্যা। পথটুকু না পেরিয়েই পথের মোড়। পরে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বিকাশ বললে—পৃথিবীতে তিনটে সুন্দর অশ্লীলতা আছে, ভাই।—জন্ম, প্রেম আর ভগবান। আর সব চেয়ে ঘৃণা করি—বিবাহ আর মৃত্যু। এমন কুৎসিত জিনিস দুনিয়াতে বুঝি নেই।

অখিলবাবু অতিষ্ঠ হয়ে চেঁচিয়ে অতঃপর ঝি-কে ডাকেন এক ছিলিম তামাক সেজে দিতে।

সাতাত্তর টাকা মাইনে পায়, সাতদিনও লাগে না ফুঁকে দিতে। তারপর বাকি তেইশ দিন ব'সে ব'সে হাঁপায় আর বিনোদের আষাঢ়ের গল্প শোনে। আজগুবি কথা বলে সব—যে-মেয়ে কবিতা বোঝে বলে সে সব চেয়ে মিথ্যাবাদী।

নিজেকে পর্যন্ত ঠাট্টা করে। বলে—বিকাশ বোস, একটা মাগী-প্যাটার্নের চেহারা, হেলে-পড়া হাসনু-হানার শাখাটি, বুকের ভিতর ধোঁয়া না-সেঁধোয় সেই ভয়ে ধীরে-ধীরে চুরুট ফোঁকেন, ডান দিকে সিঁথি কাটেন, গাল পর্যন্ত আমেরিকান জুলপি রাখেন—দেখতে পারি না। ঘেন্না লাগে। মেয়েমানুষের চুলের গন্ধ শুঁকে বমি আসার মতো। ছো!

বিনোদ আর আমি এক ঘরেই শুই, আর শোয় ঝুলে ঝুলে জাল ঝুলিয়ে বেকার মাকড়সারা।

দেওয়ালের সঙ্গে বিনোদ কথা বলে। বলে—এমনি কতটুকুই বা তুমি? ঠুনকো কাচের পেয়ালার চেয়েও শস্তা। তোমাকে তোমার চেয়ে কত বড় ক'রে দেখলাম—সে শুধু আমারই কৃতিত্ব, আমার একার গর্ব সে। যেখানে তুমি বাস্তব, স্থূল, জাজ্বল্যমান, সেখানে তুমি কত কদর্য, কিন্তু তোমার চতুষ্পার্শ্বে আমার সাধনার কল্পনার জ্যোতির্মণ্ডল রচনা করেছি ব'লেই না আমি আজ অতসীর শাখা হয়ে দূর তারকার জন্য আঁকুপাঁকু করছি। তুমি তো শুধু একটা প্রতিমা নও, তুমি—

ঈশ্বরের নামটা মুখে আসতে দেরি লাগে। যেন ঐ দেরি ক'রে উচ্চারণ করার মধ্যে কত অভিমান!

সেই বিনোদই সকালবেলায় বিকাশকে বললে—দুটো টাকা দে। কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিই চাকরি চেয়ে।

বিকাশ বললে—তার চেয়ে কিছু ন্যাংড়া আম আর পানতুয়া আনলে কাজ হত।

—তুই ভাবছিস, কিছু হবে না ওতে? আমি সোজা কথা স্পষ্ট ক'রে

জানাব যে, আমি খেতে পাচ্ছি না, বাড়িতে আমার বিধবা মা-র মরণাপন্ন অসুখ—গেল-বছরের ঝড়ে আমাদের ঘর একেবারে ন্যাংটো হয়ে গেছে—

বিকাশ বললে—দু'টাকায় অত কুলুলে হয়! একটু কম-সম ক'রেই লিখে দিস, ভাই।

রাস্তার বাঁক নিতেই প্রবোধের সঙ্গে দেখা—নতুন উকিল। গোটা বাজারটাই যেন কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

বললাম—এত ঘটা যে? নতুন ছেলের ভাত বুঝি? না, সাধ দেওয়া হবে ফের।

ও হেসে বললে—কাল একটা মোকদ্দমা জিতেছি, ভাই। তাতেই একটু—তুই চল না আমাদের বাড়ি। একেবারে খেয়ে যাবি'খন।

তথাস্তু!

কান্নিক খেয়ে গলির পর গলি পেরিয়ে যে-সুড়ঙটায় আমাকে ও নিয়ে এল, সেখানে মরণেরো পথ চিনে আসতে দস্তুরমতো বেগ পেতে হবে। বললাম—এ-গলিতে মক্কেল আসে? মোটা হলে তো ঢুকতেই পাবে না।

ও বললে—কেন, গলির মোড়ে একটা আঙুল-দেখানো সাইন-বোর্ড টাঙিয়েছি তো! সন্ধ্যার থেকে রাত পৌনে এগারোটা পর্যন্ত বৈঠকখানার দরজার কাছে একটা লণ্ঠন ঝুলিয়ে রাখি।

বললাম—ঐ কেরোসিনটা খামোকা গরচা দিস। বৃথা।

রান্নাঘরের দোরে সমস্ত বাজারটা নামিয়ে ও আমাকে একেবারে ভিতরে

নিয়ে এল, অবিশ্যি রান্নাঘরের দোর থেকে ভিতরটা দু'পা-র দু'ইঞ্চিও বেশি নয়। একটি মেয়ে টেবিলের কাছে ব'সে কি লিখছে।

প্রবোধ বললে—জ্যোৎস্না, ইনি আমার বন্ধু, ডন কুইক্সট্। আর, তুই বুঝতেই তো পারছিস, ইনি—

—আমার বউদিদি।

কথা একটা বলা উচিত ব'লেই বললাম।

মেয়েটি লিখেই চলেছে। যেন ওর আচরণে একটি অবহেলা, জায়গাটা ছেড়ে উঠল না পর্যন্ত। কিন্তু কেন যে অসন্তুষ্ট হতে পারলাম না জানি না। ওকে একটুখানি দেখলাম, যেমন এক ফাঁকে ঝড়ের রাতে বিদ্যুল্লতা দেখি। শীর্ণ মলিন চেহারা, ভোরের সূর্যমুখী যেন বিকালের আলোয় নেতিয়ে পড়েছে, ঘাড়ের উপর চুলের ফাঁসটার কাছে ঘোমটাটা একটু শিথিল হয়ে খসেছে, ললাটে দুটি ঘামের বিন্দুর উপর রোদের চিকণ চিকিমিকি, ওর শাড়ির আঁচলটা এমন সুন্দর ক'রে পায়ের কাছে লুটিয়ে না পড়লে সত্যিই যেন সব কিছু ভারি বেমানান হত।

প্রবোধ একটু বিরক্ত হয়েই বললে—কি লিখছ ওটা ?

মেয়েটিও একটু চটেই উত্তর দিলে—গয়লার হিসেব মেলাতে হবে তো ? —তখন তো আবার বকবে। পরশু দিয়েছে মোটে দেড়-পো, লিখেছে—দেড় সের।

ব'লেই বেরিয়ে গেল। আঁচলটা লুটোতে লুটোতে যাচ্ছিল।

প্রবোধ তার মোকদ্দমা-জেতার গল্প শুরু করলে। কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম 'ল-পয়েন্ট'-এর খোঁচা মেরে জজকে ঘায়েল করলে, ওর বক্তৃতায় বিপক্ষের উকিল কেমন ভেবড়ে গেল, জজ-সাহেব কেমন ওর সওয়ালজবাবের তারিফ করলেন—তারই এক ঝুড়ি বক্তৃতা। আমি যে ওর বিপক্ষ দলের

উকিল নই, আমাকে এমনি বসিয়ে নাস্তানাবুদ ক'রে যে ওর কিছুমাত্র লাভ নেই, কে ওকে বোঝাবে? ভালো লাগছে না শুনতে, তবু ওর বলতে ভালো লাগছে ব'লেই শুনছি।

রাঁধুনে বামুন নেই, একটা ঠিকা-ঝি খালি। তেত্রিশ টাকা বাড়ি ভাড়া, লাইব্রেরির চাঁদা, ট্যাক্স, ল-জার্নালের খরচ—গাউনটা এমন ছিঁড়েছে যে আর সেলাই চলে না! এমনি অফুরন্ত বেদনার কথা—কিন্তু একবার যদি নাম ফাটে! বাড়ি, গাড়ি আর লাইব্রেরি—চাই কি একটা বাগানবাড়ি পর্যন্ত।

মুখ ম্লান ক'রে বলে—দুটো ছেলে মারা গেল, ভাই। শেষেরটাও যাবে।

মেয়েটি ব্যস্ত হয়ে রাঁধাবাড়ার কাজ ক'রে চলে অভ্যস্ত ক্ষিপ্রতায়, ঝিকে বকে, নিজেই বাসন দুটো মেজে নেয়, পিঁয়াজগুলো কেটে ফেলে, ঝাঁটা দিয়ে বারান্দার নোংরাগুলো সাফ করে, রোগা মরন্ত ছেলে আচমকা কেঁদে উঠলে এক ফাঁকে ওকে শান্ত ক'রে আসে।

আবার চাবির রিং-এ শব্দ ক'রে ছুটোছুটি করে, বাজার থেকে কাঁচা লঙ্কা ভুলে আনেনি ব'লে রাগ ক'রে আপন মনে কি বলে, বোঝা যায় না। খুন্তি নেড়ে মাছ ভাজে, ঠিক টের পাই, জমাদার এসেছে ব'লে ঝিকে আগে নর্দমায় জল ঢেলে দিতে বলে, মাছখেকো বেড়ালটাকে শাসায়।

ব'সে ব'সে তাই শুনি—একটা হাল্‌কা কবিতা। অমিত্রাক্ষর নয়।

পরে এক ফাঁকে একটা ছোট বাটি ক'রে খানিকটা তেল ও একখানা ফরসা চুল-পাড়-কাপড় এনে আমাকে বললে—কলে জল থাকতে থাকতে স্নান ক'রে নিন।

প্রবোধকে বললে—তোমারও তো কোর্টের বেলা হল। আমার এদিকে সব হয়ে গেছে।

ছুটি হাতে একটি ক'রে শুধু সোনার চুড়ি, কাপড়ের পাড়টায় কচু পাতার রঙ, ঘোমটাটি তেমনি আধেক-খসা।

খাওয়া সেরে প্রবোধ ঢিলে পেণ্টালুনটা পরলে। গায়ে দিলে জ্ব'লে-যাওয়া আল্‌পাকার চাপকানটা, তিনটে বোতাম ছেঁড়া—মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোতামগুলো লাগিয়ে দিলে। জুতোর পিছন থেকে ছেঁড়া-মোজার ফুটো দুটো উঁকি মারে—ওর জুতোর দিকে নিশ্চয়ই রাস্তার মুচি আজ লোলুপ চোখে চেয়ে থাকবে।

বললে—তুই বেরোবি নাকি, কাঞ্চন?

মেয়েটি একটু চড়া গলাতেই বললে—ওঁকে তো আর আক্কেল-দাঁতের মতো মক্কেলে পায়নি! উনি জিরিয়ে যাবেন একটু।

প্রবোধ পান চিবোতে চিবোতে ছাতা মাথায় দিয়ে চ'লে যায় তারপর।

বললাম—আপনি এবার খেয়ে নিন।

—আমি? আমার সব পাট সেরে খেতে-খেতে প্রায় তিনটে।

—তিনটে?

—হ্যাঁ, ঠাকুরপোই আসেন একটার সময়—কনট্রাক্টারি করেন কি না। ঝিকে বিদায় ক'রে ওঁর ভাত আগলে ব'সে থাকি। উনি এসে পৌছুলে তবে নিশ্চিন্তি।

পাশে নিচু একটা তক্তাপোশের উপর একটি মাস দশেকের শিশু, ট্যাঁ ট্যাঁ করছে—সেই লোহার কারখানাটা মনে পড়ে—তেমনি ক্লিষ্ট, তেমনি অস্থির।

আদর ক'রে ওকে ছুঁতে যাচ্ছি একটু—মেয়েটি বললে—ওর ভারি অসুখ—

বললাম—কি অসুখ ওর?

—দেখুন না চেয়ে।

শিশুর দিকে তাকিয়ে যা না বুঝি তার চেয়ে ঢের বেশি বুঝি ওর দিকে চেয়ে—ছুটি চোখে বেদনার কি নির্মল আভা! তারপর আরেকবার শিশুর পানে তাকাই—একটা ঝড়ে-পড়া পালক-খসা শালিকের ছা—মাথার চুল উঠে যাচ্ছে, চোখের উপর একটা ব্যাণ্ডেজ—দাঁতের মাড়িতে ঘা—যে-শিশু আকাশের জ্যোৎস্না হয়ে হাসে, যে-শিশুর কামনা সুগন্ধের মতো নববধূর সমস্ত যৌবন ঢেকে মেখে রাখে—

বললাম—কি নাম এর?

—মুসোলিনি। এর ছুই দাদা ছিল—লেনিন আর ম্যাকস্থইনি। বিদায় নিয়েছে।

—লেনিন কিসে গেল?

—তড়কায়। জন্মের মাস ছুয়েক পরে হঠাৎ একদিন বিষের মতো নীল হয়ে।

—আর ম্যাকস্থইনি?

—প্রায় প্রায়োপবেশনেই।

পরে একটু থেমে বললে—আর একটি যখন হবে, নাম রাখব আবদুল ক্রিম। এরা সব যাবে, শুধু ভাগ্যের লোহার দ্বারে কপাল ঠুকে—ওদের মা-কে ঠাট্টা ক'রে—আর, আমার নাম কি জানেন?

—কি?

—বনজ্যোৎস্না। প্রাকৃতে বলে—বনজ্যোষিনী।

তাই। আমি হলে কক্‌খনো ওকে জ্যোৎস্না ব'লে ডাকতাম না—বন ব'লে ডাকতাম। ওর মধ্যে যেন আমি অরণ্যের ব্যাকুল মর্মর শুনতে পাচ্ছি—অরণ্যের সেই ব্যাকুল ও বিস্তৃত স্তব্ধতা।

দরজায় কে কড়া নাড়লে। বন বললে—ঠাকুরপো এসেছেন। কড়া-নাড়া শুনেই চিনতে পারি।

চ'লে যায়—আঁচলটা তেমনি লুটোতে লুটোতে চলে।

একটা নীল খাম নিয়ে বিনোদ লাফালাফি লাগিয়েছে—ওর বিজ্ঞাপনের জবাব এসেছে একটা।

বিনোদ খামটা না-খুলেই খুশি, বলে—কোনো মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারিই হয়তো। কিম্বা কোনো সাহেব হয়তো বাঙলা পড়ানোর জন্যে মাস্টার চায়। কেয়াবাৎ!

অখিলবাবু ঈর্ষায় ওর দিকে একটু তাকায়। বলে—বাঙলার মাস্টারকে আর কত মাইনেই বা দেবে? ত্রিশ টাকার বেশি?

—তিনশোও হতে পারে। বিনোদ বলে।

বিকাশ বলে—দেখিস, তোর পারুলের শুভবিবাহের নিমন্ত্রণপত্র না হলে হয়।

বিনোদ একটু নেড়েচেড়ে অনেক দেরি ক'রে খামটা খুলে ফেললে। প'ড়েই সারা মুখ যেন এতটুকু হয়ে গেল। সবাই উৎসুক হয়ে তাকালাম—ব্যাপার কি?

কিছুই না তেমন—আরেকটা ইংরিজি দৈনিক কাগজ বিনোদকে জানিয়েছে যে, তাদের কাগজে বিজ্ঞাপনের দর ঢের কম—এক ইঞ্চি মোটে দশ আনা, তিন ইঞ্চি দেড়টাকা—সেখানে বিজ্ঞাপন দিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখলে পারে।

বিনোদ তারপর ঘরের মধ্যে খানিকক্ষণ অস্থির হয়ে হাঁটে, আর

দাড়ি হাতায়। পরে ফের বিকাশের কাছে হাত পেতে বলে—আমাকে আর দুটো টাকা দে।

—কেন? এই নতুন কাগজটায় আরেকটা বিজ্ঞাপন ছাড়বি নাকি?

—না। ছিপ সুতো আর বঁড়শি কিনব। ঐ ডোবার ধারে ব'সে ব'সে মাছ ধরব এবার।

বিনোদ খেজুর গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পচা ডোবার নীলচে জলে ছিপ ফেলে চুপ ক'রে ঠায় বসে থাকে—আর চোখ বুজে বুজে বুঝি পারুলের কথাই ভাবে—সেই জ্যৈষ্ঠের রোদে ষোলো মাইল পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দেবার কথা—পারুলের সঙ্গে একটি বার দেখাও হল না।

বিকাশ খেপায়। বলে—একটা পুঁটিমাছও আটকাতে পারলি না এতদিনে? তোর পারুলকে একটা প্রেমপত্র পাঠা. না, গয়না বেচে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিক।

বিনোদ ছিপ ছেড়ে দিলে। এবারে ব'সে ব'সে টিনের তার দিয়ে নানান রকম আজগুবি জন্তু বানায়: টিয়া, আরশুলা, মোষ, পাখির খাঁচা বানায়, দালান, ইজিচেয়ার। বলে—এই খাঁচার থেকে পাখিটাকে বার করতে পারিস তো দাড়িগুলো কামিয়ে ফেলব এবার।

বহু কসরৎ ক'রেও কেউ পারি না। ও কিন্তু হঠাৎ একটা কায়দা ক'রে খাঁচার দরজা দুটো খুলে পাখিটাকে বার ক'রে দিলে। মন্দ কৌশল তো নয়—খুব সহজ, কিন্তু কারুর মাথায় আসে না।

একদিন দেখলাম বিনোদকে—গায়ে সেই রঙ-চটা আলখাল্লাটা, মাথায় জটা বাঁধা, দাড়িগুলোতে উকুন পড়েছে—রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সেই তারের খেলনাগুলো বিক্রি করছে। ইস্কুলের ছেলেরা চারদিক

ছেঁকে ধরেছে—পয়সা দিয়ে কিনছেও, বাড়ি গিয়ে পড়শী বন্ধু ও বোনদের তাক লাগিয়ে দেবে।

সমস্ত রাস্তার বিপুল জনতার এক কোণে ও একটুও খাপ খায় না, ছন্দপতন হয়েছে, কিন্তু রাত্রে ট্যাঁকে পয়সা আর গাঁজা নিয়ে যখন মেস-এ ফিরে আসে—তখন একটা কবিতা আপনা থেকেই তুলে ওঠে যেন।

তবু বিনোদ বলে, কিছুই হয় না নাকি ওতে। বলে—আবার সরে পড়ব। কপালে আছেই দুঃখ। দাড়িগুলিও আরও কতকটা বেড়েছে, ভালোই হল।

বিকাশ বলে—খা, খা, আরো খা খানিকটা প্রেমের কুইনিন। এবারে ঠেলা বোঝ।

বিনোদের বিষণ্ণ অথচ সুকোমল মুখ দেখে মনে হয়—কি মনে হয় জানি না—শুধু ওর সজল চোখ দুটি দেখলে কি যেন মনে হয়—

প্রবোধের বাড়ির দরজায় লণ্ঠনটা যেন আমারই জন্য জ্বালানো—লণ্ঠনটার দিকে চেয়ে মনে হল। মনে হল, ওকে রাত্রে একবার দেখে আসি!

সব নিঝুম লাগছে—এরই মধ্যে ঘুমিয়ে গেছে নাকি সব? সদর দরজা খোলাই ছিল—ঝি এখনো যায়নি। রান্নাঘর ধোয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছি। যাবার সময় লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিয়ে যাবে।

বৈঠকখানা ঘরে আলো দেখা যাচ্ছে। প্রবোধের মুখেই 'ল-পয়েণ্ট' সম্বন্ধে খানিকক্ষণ বক্তৃতা শুনে আসা যাক। ঢুকে পড়লাম।

প্রবোধ নয়, বনজ্যোৎস্না। লণ্ঠনের আলোয় টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে কি লিখছে। ওর চারদিকে তেমনি একটি নিস্তব্ধ উপেক্ষা—মধুর

ঔদাসীন্য। লেখাটা হাত দিয়ে ঢেকে শুধু একটু হাসল। কিন্তু আমি তো ওর লেখা দেখতে আসিনি।

বললাম—কি লিখছেন ?

—শুনলে হাসবেন, আমাকে বোকা ভাববেন।

—না, না।

—হ্যামলেটকে একটা চিঠি লিখছি।

—হ্যামলেটকে ?

—হাঁ, ঐ তো ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কাল কীটসের ফ্যানিকে একটা চিঠি লিখেছি—পারি তো ডন্ জুয়ানকেও লিখতে হবে একটা!

ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাই—বিকাশ হলে হয়তো বলত ন্যাকামি—কিন্তু ওর ঐ অমন ক'রে বসা থেকে শুরু ক'রে অমন ক'রে কথা কওয়াটি পর্যন্ত মেঘদূতের মতো করুণ লাগে! মনে হয়, বিনোদের মুখের সঙ্গে এর মুখের কোথায় যেন একটা মিল আছে।

বললে—এই দেখুন কালি-কলম দিয়ে হ্যামলেটের একটা ছবি এঁকেছি। কিছুই না—ইজি-চেয়ারে শুয়ে একটি লোক সিগারেট টানছে।

তারপর হঠাৎ উঠে ঘরের মধ্যে চলে যায়। বলে—বসুন, খোকাটা উঠেছে, আর ওঁর মশারিটা ফেলে দিয়ে আসি।

খানিক বাদে আবার আসে—এবার আর আঁচলটা লুটোয় না। বললে—লেনিন যখন মরেছিল তখন খুব কেঁদেছিলাম, ম্যাকস্থইনি যখন মরে তখনো খুব কষ্ট হয়েছিল—বেচারার কি যে হল আটাশ দিন ধ'রে কিছুই মুখে নিলে না, বুকের দুধ পর্যন্ত না—যেন কি অভিমান! আর এ যখন মরবে, মনে হচ্ছে, একটুও কাঁদতে পারব না। কাঁদতে ভুলে গেছি।

আবার চলে যায়—ঠাকুরপোর জন্তে ভাত-চাপা দিয়ে রেখে আসে, নেবু, জল, মিছরি বিছানার কাছে টুলের উপর রাখে, বিছানাটা পাতে—চটিজুতো পর্যন্ত এগিয়ে রেখে দেয়, পা ধুয়ে এসে পরবে।

আবার এসে বসে, বলে—যে-ঘট ভরলও না, ভাঙলও না, তাকে নিয়ে কি করব ? ভাসিয়ে দিয়েছি।

জিগগেস করলে—এত রাতে এখনো বাড়ি ফেরেননি ?

—বাড়ি নেই ব'লে।

ও হঠাৎ ম্লান স্বরে বললে—দেখুন, আমার খালি জানতে ইচ্ছা করে—কত কথা। কিন্তু যত জানব, ততই তো দুঃখ। যাই, কালকের তরকারি-গুলি কুটে রাখি গে।

ঝি চলে গেছে। বাইরের লণ্ঠনটা নেবানো। ও আবার এসে বসে। দুজনেই চুপ ক'রে থাকি। পাশের ঘর থেকে প্রবোধের জোরে নিশ্বাস ফেলার শব্দ শুনি।

তারপর কোনো কথা না ব'লেই আস্তে আস্তে বেরিয়ে যাই। ও আস্তে আস্তে এসে দরজাটা বন্ধ ক'রে দেয়। আবার ওর ঠাকুরপো যখন আসবে, উঠে খুলে দেবে।

তাশ খেলা হচ্ছে।

বিকাশ বললে—ইস্কাবনের বিবিটা এবারে অখিলদার কাঁধেই চাপিয়ে দিতে হবে।

অখিলবাবু বললেন—চারটেই দাও না কেন, নারাজ নই।

রাতের খাওয়া-দাওয়া চুকে গেছে—মেসের ও-পাড়া নাক ডাকাচ্ছে—নিঃসাড়। বারান্দায় কার পায়ের হালকা আওয়াজ পাওয়া গেল। বললাম—ঝি এখনো বাড়ি যায়নি ?

দরজার কাছে কে এসে বললে—বিকাশবাবু আছেন ?

সুদূর থেকে যেন কথা এল—ঘুমে-পাওয়া হাওয়ার ককানির মতো।

দেহ তো নয় দীপশিখা! জ্বলছে অথচ বাতাসে কাঁপছে। এখুনি যেন নিবে যাবে।

বিকাশের গলা দিয়ে বেরুল—কে, বেণু ? এস, বোসো এসে।

যেন এতে এতটুকু বিস্মিত হবার নেই। বেণু আসবে এ-যেন ওর জানা কথা। যেমন জানা কথা সকালবেলা গয়লা আসবে, বিকেলে আপিস-ফেরত অখিলবাবু আসবেন। আশ্চর্য!

আমরা সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। মেয়েটি মাথা হেঁট ক'রে রেখে বললে—যদি দয়া ক'রে একটা কথা শোন—ভারি বিপদে প'ড়ে এসেছি।

বিকাশ রূঢ় গলায় বললে—এখানেই বল, এরা শুনলে কিছু ক্ষতি হবে না।

বললাম—আমরা চললাম অখিলদার ঘরে।

বিকাশ বললে—না। বল, কি চাই ?

মেয়েটি সংকোচ ক'রে যেন কথা কইতে পারছে না, ওর চোখে জল এসে পড়েছে, গলাটা বুজে আসছে। থেমে থেমে বললে—ওঁর খুব অসুখ, অবস্থা ভালো নয়—তুমি যদি একটিবার আমার সঙ্গে আসো।

মনে হচ্ছে আমরা যদি এখানে না থাকতাম, ও নিশ্চয়ই বিকাশের পা দুটো জড়িয়ে ধরত। যেন ঐ পায়ে কত অপরাধ করেছে—

বিকাশ নির্দয়ের মতো বললে—কার ? তোমার স্বামীর ? কেন, ছশো

টাকা যার মাইনে—মোটরকার, তেতলা বাড়ি—তার কি আর ডাক্তারের অভাব হয় ? আমি তো ডাক্তার নই।

—কিন্তু তুমি সেবার আমার অসুখের সময় কি প্রাণপণ সেবা ক'রে আমাকে বাঁচিয়ে তুলেছিলে। তেমনি ক'রে যদি ওঁকে বাঁচাও—

যেন ভিক্ষা চাইছে। বিকাশ যেন বিধাতা।

বিকাশ ব্যঙ্গ ক'রে বললে—তোমার স্বামীকে বাঁচিয়ে আমার লাভ ?

কী নিষ্ঠুর এই বিকাশটা! ওর বুকটা যেন আগাগোড়া ইস্পাত দিয়ে তৈরি। বেণু এবার সত্যিই কেঁদে ফেললে। মনে হল, এখুনিই যেন বিকাশের পায়ের তলায় মাথা লুটিয়ে দিয়ে কপাল কুটে মরবে। কাঁদতে কাঁদতে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে একলা নেমে চলে গেল।

বিকাশ বারান্দায় উঠে এল। রেলিঙটায় ভর দিয়ে দাঁড়াল একটু। বললাম—একি করলি বিকাশ ? শিগগির চল তুই—

বিকাশ বললে—কেন, আমি ভাড়াটে নার্স নাকি যে যার-তার অসুখ হলেই ছুটে যেতে হবে—রাত জেগে ?

—যার-তার অসুখে নাই বা গেলি। এ যে বেণুর স্বামীর—

—কক্‌খনো না।—এমন ভাবে হাত ঘুরাল যে লেগে কাঠের রেলিঙটা ঝেঁকে উঠল।

—তবে শিগগির আমাকে ঠিকানা দে—আমি যাচ্ছি। একলা পথে—

—নম্বর জানি না, তবে বাড়িটা চিনি। নাম : 'বেণুকুঞ্জ'।

পথ চিনে চিনে যখন এলাম, রাস্তায় মোটরের ভিড় লেগে গেছে। ভিতর থেকে কান্নার তুমুল রোল উঠেছে। বুঝলাম—নেই ; হয়ে গেছে। ভিতরে ঢুকে গেলাম। মৃতের মন্দিরে কারুরই জন্যে নিষেধ নেই। সবাই ভাবলে—আমি বেণুর স্বামীর বন্ধু, হয়তো বা বেণুরই।

বেণুর সে কী কান্না! অনেকদিন এমন কান্না শুনিনি। শুধু শুনেছিলাম পদ্মার সেই অকূল বন্যাস্রোত—শুনেছিলাম উন্মুক্ত প্রান্তরের পারে সেই উদ্দাম বৃষ্টিজলধারা। বুকটা জুড়ায়।

সমস্ত সান্ত্বনা, সহানুভূতি, উপদেশ,—গীতা, উপনিষৎ—সব ভাসিয়ে ছারখার ক'রে দিচ্ছে। প্রলয়ের কালে সাগর যেমন কাঁদে। মা-র গলা জড়িয়ে একটি ছোট কৃশ সুশ্রী ছেলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে—মা কাঁদছে ব'লে।

সবাইর সঙ্গে শ্মশানে গেলাম। ফিরে এসে বাকি রাতটা সে-বাড়িতেই কাটালাম। আর জেগে খালি বেণুর কান্না শুনলাম।

শুধু প্রচুর নয়, অবিশ্রান্ত!

সকালবেলা পা যেন আর চলছে না—বিকাশকে খবর দিতে হবে। হয়তো নিষ্ঠুরের মতো বলবে—ভাবনা কি? স্বামীর লাইফ ইন্‌সিওরেন্সে দেদার টাকা আছে—প্রকাণ্ড বাড়ি। দেখিস, ঠিক মোটা হয়ে যাবে এবার নিরামিষ খেয়ে খেয়ে। তারপর কাশী যাবে।

রাস্তায় রাস্তায় করতাল বাজিয়ে কে এক বুড়ো হরিনাম ক'রে ভিক্ষা করছে—কাঁধে একটা ঝুলি।

চমকে উঠি—আরে কবরেজমশাই যে! যিনি আমাদের মেস-এর নিচের তলায় পিত্তশূলের বড়ি বেচেন।

ফোকলা মাড়ি দুটো বার ক'রে কবরেজমশাই বললেন—আর ক'টা দিনই বা আছি বাবা, হরির নাম ক'রে যাই।

ট্র্যাম কণ্ডাক্টারের সঙ্গে চেনা ছিল—ডাকলে। উঠে বসলাম।

কতদুর এগিয়েছি, পিছন থেকে কে বললে—যদি কিছু দেন।

চেয়ে দেখি—লোকটার হাতে একটা জাপানী-বাক্স—চারদিক আটকানো পেরেক দিয়ে, মাঝখানে পয়সা ফেলবার ফুটো। ধারে আঠা দিয়ে একটা কাগজ মারা—তাতে ইংরিজিতে লেখা : 'গরিব ছাত্রদের ফণ্ড'।

মাথার চুলগুলি সব কেটে ফেলেছে—দাড়ি-গোঁফ কামানো, তেমনি খালি পা, পরনে ও গায়ে ছেঁড়া কাপড় জামা—কোত্থেকে জোগাড় করেছে কে জানে—বিনোদ এ আরেকটা মন্দ ফিকির করেনি।

পকেটে যা কয়েকটা পয়সা ছিল বাক্সে ফেলে দিলাম। আরও অনেকে দিলে।

এর পর বিনোদের বেজায় অসুখ ক'রে বসল—ভেদ বমি, জ্বর, সব কিছু। দুদিনেই যাবার দশা।

বললাম—তোমার পারুলকে একটা খবর পাঠাই। ও আসুক।

ও আমার হাতটা কপালের উপর রেখে বললে—বাড়িতে একটা তার আর কিছু টাকা পাঠিয়ে দিতে বল বিকাশকে।—আমার মা আর বউ চ'লে আসুক।

—বউ?

—হ্যাঁ। নাম নগবালা।

ওর মা আর বউ এল দুদিন বাদেই। অবস্থা বেশ সঙিন হয়ে আসছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই, আপিস নেই—অখিলবাবুরও না।

ওর মা খালি কাঁদে, কিন্তু ওর বউ একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করে না। খালি চুপ ক'রে ব'সে থাকে।

বিকাশ বলে—আমার হাত থেকে কোনো রুগীকেই যম ছিনিয়ে নিতে পারেনি। এবার বোধ হয় প্রথম নেবে। বোধ হয় বেণুর অভিশাপ লেগেছে।

সকালবেলা আশ্চর্য রকম অবস্থার পরিবর্তন দেখা গেল। বিনোদ জ্ঞান পেয়ে ওর মা আর বউকে চিনতে পারলে।

একলা পেয়ে বিকাশকে বললাম—এ কেমনতর বউ, ভাই? মরতে চলেছে দেখে একটুও কাঁদলে না, ভালোর দিকে দেখে একটু খুশিও হল না। একটি কথা কইল না পর্যন্ত!

বিকাশ বললে—ও যে বোবা।

—বোবা? বলিস কি?

—হ্যাঁ

—তবে পারুল?

—দূর বোকা। তাও বুঝি বুঝতে পারিসনি? পারুল ব'লে কেউ নেই। তাকে ও মনে-মনে রচনা করেছে। তাই তো পারুল বিয়ে করেনি। তাই তো ওর সঙ্গে মিলনের জন্যে দুঃখের তপস্যা করছে।

প্রবোধের বাড়ির লণ্ঠনটা—আবার।

বৈঠকখানায় ঢুকলাম, বনজ্যোৎস্না টেবিলের কাছে চুপচাপ ব'সে আছে। কি লিখবে তাই ভাবছে যেন। আঁচলটা তেমনি পায়ের কাছে লুটোন।

বললাম—মুসোলিনি কেমন আছে?

বনজ্যোৎস্না লেখার থেকে চোখ না তুলেই বললে—এইমাত্র ওঁরা ওকে শ্মশানে নিয়ে গেলেন। ভালোই আছে।

মৈত্রেয়ী

তারপর ইউনিভার্সিটিতে এসে গেলাম। ঠিক পড়তে কি ?—না কোনো কাজ ছিল না ব'লে ?

মনে হয়, ওর সঙ্গে দেখা হবার যেন দারুণ দরকার ছিল। নিরালা কোণে লাস্ট বেঞ্চিতে দেখা। যে মোটা বইটা নিবিষ্টমনে পড়ছে সেটা সাহিত্যিক জমাদারদের মতে নোংরা। আমার হাতের উপর ওর শির-ওঠা শীর্ণ হাতখানি তুলে দিয়ে বললে—কত জ্বর আছে বলতে পারেন ?

—ঐ বিতিকিচ্ছি বইটা পড়ার দরুন হয়তো। চলুন বাইরে—

ওঁচা প্রোফেসার তার ওঁচানো গোঁফ ফুলিয়ে তাকায় একবার। মৈত্রেয়ীও তাকায় হয়তো। ঠিক তাকানো নয়, একটু যেন সজাগ হয়ে ওঠা। লাস্ট বেঞ্চিটা গরিব, কানা হয়ে গেছে।

আমরা বেরিয়ে যাই।

বলি—আপনাকে আমি দেখেছি আগে, ঠিক ভালো জায়গায় নয়।

সৌম্য একটু হাসে, বলে—অভিযোগ করছেন না নিশ্চয়ই। কেন না—

—কেন না আমিও সেই পাড়ারই বাসিন্দা। এত সস্তায় আর কোথাও ঘর পেলাম না ব'লে।

—কি ক'রে চালান ?

—আগে এক জায়গায় টিউশনি করতাম—সংস্কৃত। ইস্কুলের ছেলে। তিন মাস যায়, মাইনে দেবার নাম নেই—বলে, পূজোটা এসে গেলেই পুরোদমে তিন মাসেরটাই পাওয়া যাবে। তাও যখন পেরিয়ে যাচ্ছে, তখন কোমরে কাপড় কেছে ব'সে গেলাম ভুল শেখাতে। এতদিন ধ'রে যা সব শিখিয়েছিলাম, সব বেমালুম বাতিল ক'রে আঠারো দিনে এইসা ভুল শিখিয়ে দিয়ে এসেছি ভাই, যে বেচারা ছেলে ছ'মাসেও তা ভুলতে পারবে না। এখন একটা পানের দোকান খুলেছি। চলুন না আমার দোকানে। পান খান ?

—প্রচুর। শুধু খাই না, করিও।

পরে বলি, আস্তে—আগে মাঝি ছিলাম। একটা ডিঙি ছিল—স্রোতের শ্যাওলা। ফুরফুরে ফড়িং।

সৌম্য হঠাৎ কৌতূহলী হয়ে বললে—তার আগে ?

—রাস্তা খুঁড়েছি, বস্তা টেনেছি, মোটরে মোটরে টক্কর লাগিয়েছি, চাকরির উমেদার হয়ে পথে জিরিয়ে জিরিয়ে পায়চারি করেছি। একবার লাঙলও ধরেছিলাম বাগিয়ে।

—তবু পেলেন না তো তাকে ?

—কাকে ?

—নোফালিস্‌-এর নীলফুল, বোয়ার্‌-এর শ্বেতহংস। চলুন, পকেটে সাড়ে তিনটে টাকা আছে—একটা বই কিনি গে। টাকা তিনের মধ্যে—রাতের খাওয়ার জন্যে গণ্ডা আষ্টেক না রাখলেই নয়। সমস্ত দিনটা কিছু যায়নি পেটে।

কেমনতর যেন। সোজা চলতে গিয়ে ডান পাশে হেলে, পায়ের চটিটা পিছনে ফেলে এসেছে, সামনে অনেকদূর হেঁটে এসে তবে টের পায়,

সোজা রাস্তায় না গিয়ে ঘুর-পথে বেঁকে বেঁকে চলে—কোথাও যেন যাবার নেই—বুকের উপর জামার সমস্তগুলি বোতাম খুলে রাখে।

চেনা দোকানদার। মুখ খুশি ক'রে ব'লে ওঠে—আজকের ডাকে এই বইটা এল। আপনার জন্য রেখে দিয়েছি—

প্রিয়ার লতানো পেলব হাতখানি যেমন ক'রে ছোঁয়, নামিয়ে রেখে দিতে ইচ্ছে করে না। দুঃখী যেমন মদের বোতলটা বুকের কাছে টেনে নেয়।—সৌম্যর দুই চোখ সুখে ফুলে উঠল।

পকেটটা উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়ে বললে—বাকি দামটা দু-একদিনেই দিয়ে দেবার চেষ্টা করব। আজ আর নেই।

দোকানদার হয়তো একটু আপত্তি করে। আমি দিয়ে দিই বাকিটা।

সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে কোন পুরনো চেনা বন্ধু যেন ওকে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়েছে। তেপান্তরের মাঠের পারের কার যেন স্নেহস্পর্শ—বহুদূরের কোন তুষারাবৃত আকাশের সুস্নিগ্ধ অভিবাদন! কার যেন করুণ একটি দীর্ঘশ্বাস—ওর কাছে সহানুভূতি চায়—অতি দূর থেকে কে যেন ওকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

পথে নেমে বলি—রাত্রে কি খাবেন তা হলে?

ও বলে—আজ রাত্রে বিধাতা যেমন অন্ধকারে তাঁর হৃদয় মেলে দেবেন তারার অক্ষরে, তেমনি আমার এই বন্ধু তার হৃদয় মেলে ধরবে আমার আতুর চোখের সামনে। হয়তো বা আলো নিবিয়ে দেব। হয়তো বা আর পড়তে পারব না। কিন্তু সমস্ত প্রাণে কি প্রগাঢ় উত্তাপ, কি অকূল পরিচয়, কি সুদূর ভালোবাসা! কত রাত আমার এমনি কেটে গেছে।

আবার সেই চলা, এঁকেবেঁকে, তেরছা টিকটিকির মতো, পথের কুকুরকে অকারণে একটা লাথি মারে, ঢিল কুড়িয়ে নিয়ে কোনো দিকে লক্ষ্য না

ক'রে ছুঁড়ে মারে, ইচ্ছে ক'রে জামাটা টেনে একটু ছিঁড়ে দেয়। আমাকে হঠাৎ বলে—তুমি ভারি দরাজ, দিলদার। তুমি আমার এই খুশখতের পিওন। ব'লে আমার কাঁধে ওর লিকলিকে বাহুটি তুলে দেয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এ যেন ওর বিবাহ-গোধূলি! ওর হাতের সবুজ রঙের বইটি যেন ঐ সন্ধ্যাতারার মতোই আপন, অপরূপ। এ ওর বই নয়, যেন বউ! সোনা বউ!

আমার পানের দোকানে ওকে নিয়ে এলাম। পুতলিকে বললাম—এক নতুন বাবু ধ'রে এনেছি, দেখ, এবার পছন্দ হচ্ছে?

সেই পুতলি—একটা চোখ কানা, আরেকটায় সেই আগেকার তন্দ্রালুতা। সেই চোখে অস্ফুট ভর্ৎসনা পুরে বললে—কলেজ তো কখন কাবার হয়ে গেছে, এত দেরি হল যে? আমি কখন থেকে খাবার গুছিয়ে ব'সে আছি।

বললাম—মাতব্বরের মতো বকিস নি আর। দুটো থালায় দিস।

ছোট্ট পানের দোকান—কলেজের সামনেই। কলেজ থেকে পাড়াটা অনেক দূর, তাই পুতলি দুপুরে খাবার তৈরি ক'রে এনে দোকানে রেখে দেয়। গিলে নিয়ে টিলে মেজাজটা বেশ শরিফ ক'রে শফর শুরু করি—এই বরাদ্দ।

ভুল ক'রে আমাদের গোঁফওলা প্রোফেসারটি—তাঁর ও-পাড়ায় নিয়মিতই গতিবিধি আছে—পুতলির দোরে টোকা মেরেছিল একদিন। খুসো গোঁফ দেখে পুতলি ওর খসা খ্যাংরাটা নিয়েই তেড়ে এসেছিল। প্রোফেসারকে একটা নমস্কার ঠুকে দিয়েছিলাম।

মাচার উপর পুতলি আমাদের জন্যে একটু জায়গা ক'রে দেয়। পা ঝুলিয়ে

বসি দুজনে। বললাম—সিংহাসনে ব'সে বেড়ে কারবার করছিস! বেশ! ক'জনের মুখ পুড়লি?

থালাটা থেকে তুলে সৌম্য একটু খায় কি না-খায়, নিবন্ত দিনের আলোয় বইটার উপর বুক দিয়ে রয়েছে—মাঝখানটা খোলা, যেন বইয়ের হৃৎপিণ্ডের উপর কান পেতে আছে।

বলি—তখন আমি রাজমিস্ত্রির কাজ করি, সৌম্য। বড় লোকের ছেলে নতুন বিয়ে করেছে—তাই তার প্রেমগুঞ্জনের জন্যে দোতলার ছাদে চিলে-কোঠা উঠবে। আমরা বাঁশ বেঁধে কাঁধে বালি-সুরকির ঝুড়ি নিয়ে প্রায় একুশজন লেগে গেছি। যে-দরজা দিয়ে দক্ষিণ থেকে হাওয়া এসে নববধূর খোঁপা এলো ক'রে দেবে—সে-দরজা আমরাই বানালাম। পুবের জানলাটা এমনি ক'রে বসালাম, যাতে শুয়ে শুয়েই বর-বধূ ভোরের ডুবন্ত শুকতারাটি দেখতে পায়, ছোট্ট একটা ঘুলঘুলি ক'রে দিলাম উত্তরের দেয়ালে, ভীতু দুটি চোখ রেখে লাজুক বউ ওর স্বামীকে দেখবে কখন ঘরে ফিরে আসে—বুকের ঘাম ঢেলে ঢেলে শ্বেত পাথরের মেঝে শীতলপাটির মতো শীতল ক'রে দিলাম।—তোর লখিয়াকে মনে আছে, পুতলি?

পানের উপর চুনের কাঠিটা বুলোতে বুলোতে পুতলি বলে—তা নেই আবার!

—লখিয়ার তখন সবে বিয়ে হয়েছে, তাই ওর প্রাণ সব চেয়ে টাটকা। মেঝের ওপর এনে ইঁট গাদা করে, আর ফিসফিসিয়ে সখী সুখীকে বলে—টমরুর চুমুর মতো মিষ্টি কি ওদেরও? পরে লখিয়ার কি হয়েছিল, জান সৌম্য? একটা আধ-মনি ইঁটের পাঁজা তুলে আনতে গিয়ে ঘামে ভেজা বাঁশ পিছলে সটান মাটিতে পড়ে গেল—আর উঠল

না। টমরুর চোখের জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওর মাথা ফেটে রক্ত ছুটল—ওর সিঁথির সিঁদুরের মতোই ডগডগে।—সেই, কাজে ইস্তফা দিয়ে এলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল খানিকটা সদ্য রক্ত মেঝেটার ওপর মেখে দিয়ে আসি। ও তো নববধূটির এক হিসেবে সখী, ও-ও নববধূ। বড়লোকের ঘরের নতুন বউটি যেন এই ছোটলোকের ঘরের মজুর-বউটির জন্যে একটু অন্তত চোখের জল ফেলে। গামছা দিয়ে গায়ের বালি মুছে ফেলে রাস্তায় নেমেই পুতলির সঙ্গে দেখা। কানা পুতলি। আমার হাতটা ধ'রে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে বললে—এতদিন কোথায় ছিলি? আমি তোর জন্যে এ দু-বছর ফ্যা-ফ্যা ক'রে ঘুরেছি—কলকাতার কোনো গলি, কোনো কারখানা বাকি রাখিনি।—এমন কথা কোনোদিন শুনেছ, সৌম্য? টমরুর ঐ বুক-ফাটা আর্তনাদের মতোই কি বিস্ময়কর নয়?

সৌম্যর এসব ব্যাপারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই, কৌতূহল নেই—কোলের কাছে যেটুকুন গ্যাসের আলো পড়েছে তাইতেই ও দূর নরওয়ের সুনীল ফেনিল জলতরঙ্গের স্বপ্ন দেখছে—আফ্রিকার সেই গৈরিক তাপসী বন্ধ্যা মাটির স্বপ্ন—সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত নির্যাতিত বন্দী-বীরের—

পুতলি বললে—তা নয় তো কি? মনে প্রাণে তোমাকে চেয়েছিলাম ব'লেই তো একদিন হঠাৎ দেখা পেয়ে গেলাম। সেদিন টমরুর কান্না আমার কানেও সেঁধোয় নি। সেবার বারো বচ্ছর পর গাঁয়ে গিয়ে দেখি পলাশ-পুকুরের পাড়ে এক পিটুলি গাছ দাঁড়িয়েছে—সবাই গোড়ায় তেল সিঁদূর মাখে, ডাব নারকেল দেয়—বলে কি না, যা-কিছু মনে ক'রেই ওর ডালে সুতো বেঁধে দেবে, তা যাবে অব্যর্থ ফ'লে। কাপড়ের সুতো ছিঁড়ে তক্ষুনি বেঁধে দিলাম, চট ক'রে মনে প'ড়ে গেল,

হে দেবতা, সেই বাবুটির যেন আবার দেখা পাই—যে আমাকে গোলাপী জামা কিনে দিয়েছিল। সেই জামা আজও আমার বাক্সে আছে—ধুইনি।

হাসতে পারি না, ঠাট্টা করতেও মন ওঠে না। ও-ই আমার পড়া চালায়, তারই জন্য বোধ হয়।

বলে—এবার আর পায়ের জুতো হয়ে নয় যে, ইচ্ছে ক'রে ফিতে খুলে পালাবে। পায়ের ধুলো হয়ে লেগে থাকব।

—ধুলো ধুয়ে ফেলতে কতক্ষণ? কিন্তু বলি না।

বললাম—ঘরে যাবে না, সৌম্য?

ও চমকে উঠল।—রাত হয়ে গেল ঢের। একটা মোমবাতি কিনে দাও ভাই। তিনটে, ঘুম তো শিগগির আসবে না। চল আমার ঘরে।

ঘর তো নয়, ছোটখাটো পৃথিবী! তেমনি এঁদো, তেমনি ভ্যাপসা।

হতচ্ছাড়া ঘরটা—দেয়ালে নোনা ধরেছে, চারদিকে অতিকায় কতগুলি আলমারি—কাচগুলি প্রায়ই সব ভাঙা, সারিসারি রাশি রাশি বই সাজানো এলোমেলো ক'রে—মেঝের উপর এক গাদা বই টাল ক'রে ফেলা—হিজিবিজি। কোণে ক্যানভাসের একটা ইজি-চেয়ার, চটটা ছিঁড়ে গেছে, তারই উপর মোটা একটা নীল পেন্সিল।

মোমবাতি জ্বালাই।

ও বললে—রুশিয়ার সঙ্গে ইংলণ্ডের কোলাকুলি দেখ, ফ্রান্সের সঙ্গে ইটালির—আর ভারতবর্ষের সঙ্গে জাপানের, নরওয়ের সঙ্গে স্পেনের কি অপার বন্ধুতা! অদ্ভুত!

চোখ ফেরানো যায় না—ওর ভাঙা ঘরে অলকানন্দা যেন মুখর, উদ্বেল হয়ে উঠেছে—কান পেতে শুনতে হয়, প্রাণ পেতে।

তাকের বইগুলি অন্তরঙ্গ আত্মীয়ের করতলের মতো সস্নেহে স্পর্শ ক'রে ও বলে বিভোরের মতো—বাঙলার কোণে ব'সে বিপুল জগতের সঙ্গে কথা কই, টলস্টয় মেঝের ওপর পা ছড়িয়ে বসে—ডষ্টয়ভ্স্কি কাঁধের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে মধুর ক'রে হাসে, রাতের খাবারটুকু গোর্কির সঙ্গে একত্র খাই ; হামসুন হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে ব'সে বন্ধুর মতো গল্প ক'রে যায়—জ্বরো কপালে বোয়ার তার কোমল হাতখানি বুলিয়ে দেয়—নীল সাগরের কল্লোলিত মায়া তার চোখে, ফ্রাঁন্স কতদিন আমার এই ঘরে ব'সে জিরিয়ে গেছে। সেদিন তো কালো ঝড়ো মেঘের মতো ব্রাউনিঙ এসেছিল—সঙ্গে ব্যারেট, রুখু মাথা, রোগা চোখে অপূর্ব বিষণ্ণতা! ঘরে ঢুকেই বললে—আমাদের একটু জায়গা দিতে পার এখানে? কত দূর থেকে পালিয়ে এসেছি। তিন জনে মেঝের ওপর ব'সে কত গল্প করলাম—আমার ঘর যেন ইটালি! সব স্বপ্ন!

পরে চেয়ারের উপর গা এলিয়ে দিয়ে বলে—জ্বরটা জোরেই এল কিন্তু। মেঝের ওপর কোনো রকমে শোবার ব্যবস্থা ক'রে দেবে ভাই? আলোটা শিয়রেই জ্বলুক।

বলি—কাদের বাড়ি এ? কি ক'রে চলে তোমার?

কতগুলি বইয়ের উপর মাথাটা রেখে বলে—বাড়ি অন্যের, ভাড়া নিয়েছি এ ঘরটা, হোটেলে পয়সা দিয়ে খাই। চলে কি ক'রে? দিদি মাসে ত্রিশ টাকা পাঠান—তাইতেই—উনত্রিশ টাকার বই কিনি, ধার করি, ফের বই বেচে ধার শুধি।

গোঙাতে গোঙাতে বলে—বাড়িতে মা আর ছোট বোন, আট পহর

মৃত্যুর মুখের দিকে চেয়ে আছে। ঝড়ে আটচালাখানা লোপাট হয়ে গেছে, নিজের জন্যে দুটো ফুটিয়ে নিতে গিয়ে মা দুহাত আর পা পুড়িয়ে ফেলেছে—ছোট বোনটা আজ চিঠি লিখেছে।

থেমে বলে—ফুঁ দিয়ে সব পুঁজিপাটা উড়িয়ে দিয়ে বাবা চলে গেলেন—রেখে তাঁর রক্ষিতা, রোগ আর লালসা। রোগ গচ্ছিত রেখে গেলেন আমার বুকে, আর লালসা দিদির। ছিঃ, তাকে কি সত্যিই লালসা বলে?

—জরটা যদি এসেই গেল, তবে আলোটা নিবিয়ে দিই, এবার ঘুমোও।

—পুড়ে পুড়ে আপনিই নিবে যাবে। এখনো মাথা তেমন ধরেনি, খানিক ক্ষণ পড়া যাবে। এই জানলা দিয়েই হয়তো কোনো ব্যথিত সমুদ্রের নিঃশ্বাস ভেসে আসবে—কোনো একটি মেঠো মেয়ে তার মিঠা দুই চোখে আমার দিকে চাইবে—অনেক ক্ষণ, যত ক্ষণ না বাতিটা নেবে। তারপর—

হঠাৎ বললে—ফ্রেঞ্চ শিখছিলাম ভাই। ইচ্ছে করে রাশিয়ান শিখি। এদেশে পাওয়া যায় না মাস্টার?—আমি রাশিয়ায় যাব, বরফের ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যাব মাইলের পর মাইল, তারপর আমাকে কেউ বাঁচাবে।

যেন ক্ষেপে ওঠে। ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো চক্ষু ধারাল বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

মনে হয়, ও যেন বন্দী প্রমেথেউস।

পচা পাড়া, বিজাত—সামনেই অভিজাত রাস্তা। একই মায়ের পেটের দুই ছেলে-মেয়ের কি অসম্ভব অপরিচয়—যেন কত কালের আখোটি!

এ একেবারে আলাদা রকমের জগৎ। নতুন আইন-কানুন সব—নতুন ধরনের নীতিজ্ঞান, নতুন নমুনার কুসংস্কার। সব কিছুর পরেই উদাসীন, নির্লিপ্ত—বৈরাগী, নিঃসম্বল!

বড় রাস্তা তার সদর দরজা দিয়েই জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে জড়ো করে এই চিপা গলিতে জাকজমক ক'রে ভর-দুপুরে—আবার এই গলিটা থেকেই জঞ্জাল কুড়িয়ে নিয়ে যায় মাঝ রাতে, লুকিয়ে—খিড়কির দোর দিয়ে।

কিন্তু সৌম্য এখানে কেন? ও-ও কি সদাগর, অন্তত ও কি রাজপুত্র নয়? ঐ যে শোভনাঙ্গী মেয়েটি রাত দুটো পর্যন্ত গ্যাসের তলায় ব'সে থাকে উদাসিনীর মতো—ওকে এসে ও কি জিগগেস করে? হয়তো শুধোয়—তুমি কেমন আছ? দোর পেরিয়ে পর্যন্ত ঘরে ঢোকেনি। মেয়েটি সারা রাত জেগেই ব'সে থাকে কোনো দিন। যেন দেয়াশিনী ও।

রাত প্রায় দশটায় ঝাঁপ বুজিয়ে পুতলি আসে, আঁচল দিয়ে বাতাস করতে করতে বলে—ভাত তো গামলার নিচেই ছিল, খেয়ে নিলে পারতে—

—তোর জন্যে ব'সে ছিলাম।

—বেশ লোক যা হোক, তুমি খেলে পরে তো আমার খাওয়া। এই নাও আজকের বিক্রি নিয়ে একুশ টাকা হয়েছে। পড়ার যা কিছু দরকারি, এবারে কিনে নাও কতক। হ্যাঁ গো, আজও সেই মুখপোড়া মাস্টারটা এক পয়সার পান কিনবার অজুহাতে ঘেঁসেছিল—বেহায়ার বেহদ্দ। ইচ্ছে হচ্ছিল দিই চুনকাঠিটা গালে বুলিয়ে।

মাচার উপর শুলে পুতলি পায়ের তলায় হাত বুলিয়ে দেয়, কখনো কখনো লম্বা চুল, ঘুমিয়ে গেলে ভেজা মুখটাও হয়তো।

বলি—এ-রকম ভাবে আর কতদিন, পুতুল?

—তোমার ফুটফুটে জ্যোৎস্নার মতো একটি বউ হবে, আমি তার দাসী হব—সেইদিন।

মাটিতে আঁচল পেতে ঘুমোয় মাদুর বিছিয়ে। বলে—কোনো গয়নাপত্র চাই না—না কোঠাবাড়ি, না-বা নাকের একটা নথ—শুধু তোমার বাঁ পাশে সর্ষে ফুলের মতো টাটকা, টুকটুকে একটি বউ হোক!—পরে আমি না হয় বউ-কথা-কও পাখি হব।

এ যেন খেলো পানওয়ালির কথা নয়।

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠি—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কে কাঁদে রে, পুতুল?

—ঐ বামুন-দিদি—তিন রাত ঠায় বসে আছে দোর গোড়ায়।

কে? যার দাওয়ায় সৌম্য একদিন উঠে এসেছিল ভুল ক'রে? কেন?

মৈত্রেয়ীর সঙ্গেও কি দেখা হবার দরকার ছিল? হয়তো নয়! কিন্তু আজকের এই আনমিত হঠাৎ-ঝাপসা-ক'রে-আসা আকাশ দেখে কেন ও মেঘ-রঙের শাড়ি প'রে এসেছে?

ও যেন বাঙলার মাটি—শ্যামল, সুশীতল!

নমস্কার ক'রে বসলাম। একেবারে ঘাবড়ে গেল। পাশের দেয়ালের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যেতে লাগল—যেন আমি প্রকৃতিস্থ নই।

ভাগ্যিস জিভের ডগায় কথা জুয়ালো—ঢোক গিলে বললাম—আপনি বনজ্যোৎস্নাকে চেনেন?

ওর চোখ দুটির দিকে যত তাকাই, ততই ওর দৃষ্টি শ্লথ, শীতল হয়ে আসে। বললে—কে বনজ্যোৎস্না? বনজ্যোৎস্না মিত্র?

—হ্যাঁ, মিত্র। আমারও।

—চিনি। কবে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে?—কোথায়?

—পদ্মার ওপরে—নৌকোতে।

আরও বললাম—আপনি ওর ডুমুরের ফুল ছিলেন—ঈদের চাঁদ। বোর্ডিঙে যখন একসঙ্গে থাকতেন তখনকার অনেক গল্পও শুনেছি আপনাদের—

—কেমন আছে ও? এখনও ঐ পদ্মার পারেই আছে? ওর সঙ্গে কিন্তু আমার ভারি দেখা করতে ইচ্ছে করে—যাওয়া যায় না ওখানে? ওর স্বামী নিশ্চয়ই তাড়িয়ে দেবেন না। আমার নৌকোয় বেড়াতে খুব ইচ্ছে করে—মাঝ-নদীতে।

অনেকগুলি কথা ব'লে ফেলে একটু হাঁপায়, জামার তলা থেকে সোনার সরু সুংলিটি বার ক'রে অনামিকায় জড়ায়—হাতের তালুটি ভেজা—দুটি চোখে সমস্তটি হৃদয় যেন টলটল করে।

হঠাৎ বললে—আপনি রোজ রোজ ক্লাশ থেকে পালিয়ে যান কেন? একটুও স্থির হয়ে বসতে পারেন না?

শ্যামল ঘনপল্লব অরণ্যের মধ্যে ঘনবল্লীর মতো ওর তনুলতা, পরনে মেঘডুম্বুর শাড়ি—দুটি চোখ দুরবগাহ!

—কেন, খুব নিঃশব্দেই তো যাই—টের পাওয়া উচিত নয় কারুর।

—প্রোফেস্যার পান না বটে, কিন্তু আমি বুঝি। লাইব্রেরিতে পড়েন বুঝি গিয়ে?

—লাইব্রেরি? কোন তলায় তাও জানি না—এমনি ঘুরে আসি একটু।

ও একটু হাসে, সে তো হাসি নয়, সম্বোধন! আকাশের মেঘ যেমন মাটির দুর্বল দূর্বার পানে চেয়ে হাসে। আজকে এ-রকম মেঘ ক'রে না এলে কখনও ওর স্ফুরিত ঠোঁটের কোণে হাসি ভেসে উঠত না, তার অর্থও থাকত না কোনো।

ওর দুটি চোখ যেন সাগরের দু'চামচে নীল জল!

একটি ভদ্রলোক—গায়ে মুসলমানি ছিটের পাঞ্জাবি, একচল্লিশ ইঞ্চি ঝুল, —পরনের কাপড় কিন্তু প্রায় আট-হাতি—ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি লোলুপ নয়—কাতর, ভারি অসহায়! ঐ ঘুমন্ত মেঘের সঙ্গে ওরও চোখের আদল আছে। দরিদ্রতায় ভরা।

করিডোর দিয়ে যে-ই হেঁটে যায়, সে-ই উৎসুক হয়ে আমাদের দেখতে থাকে, কেউই নির্বিকার নয়—সামনে দিয়ে দু'তিনবার ক'রে টহল দিয়ে যায়। মৈত্রেয়ী একা ওদের যত না চঞ্চল করেছে—ওর পাশে আমাকে দেখে সবাই একেবারে উদ্বাস্ত, অস্থির হয়ে উঠেছে। গোবিন্দ পর্যন্ত ভাবছে—ঐ আট-হাতি খদ্দরের থান প'রে ওরই দাঁড়াবার কথা মৈত্রেয়ীর পাশে—ক্লাশে প্রোফেসারের সঙ্গে অকারণ তর্ক ক'রে বিদ্যে ফলিয়ে ও তো নিজের বিজ্ঞাপন আর কম দেয়নি। ডান হাতের আঙুল দিয়ে খোঁচা খোঁচা দাড়ি খোঁটে, চোখের পাতা পিটপিট করে, এমন ভাবে তাকায়—আমি যেন রোডস-এর পিত্তলমূর্তি : কলোসাস।

প্রোফেসার-ও একটু ঘেঁষে। মৈত্রেয়ীকে বলে যায়—শনিবারে আমার কাছে আপনার টিউটোরিয়্যাল। এই নিন নোটটা—হাতছাড়া করবেন না। খুব স্কেয়ার্স।

চ'লে গেলে বললাম—টিউটোরিয়্যাল-এ আপনি একাই পড়বেন বুঝি ওঁর কাছে। একা হলে খুব যত্ন নিয়েই পড়াবেন নিশ্চয়।

ও ফট্ ক'রে বললে—আপনিও আসুন না ওঁর ক্লাশে। হ্যাঁ, খুব নেবেন। কেন নেবেন না? না, আপনাদের দরকার হয় না ও-সব কিছু।

সত্যিই। সেদিন মৈত্রেয়ী ক্লাশে আসেনি, প্রোফেসারের পড়া ভালো মতো জমলই না, সব ছেলেই কেমন উসখুস, কোথায় যেন তাল কেটে

গেছে—সব মিউনো, ম্যাজমেজে। তাই যতক্ষণ না মৈত্রেয়ীকে বারান্দায় পা ফেলতে দেখে—লঘু দুটি পা—ততক্ষণ প্রোফেসার পায়চারি করে বেড়ায়। ক্লাশে ঢুকলেই ছেলেদের গোমড়া মুখ এক মুহূর্তে কোমল হয়ে আসে। ভাব ভাষা পায়—কবিতার প্রথম লাইনটা খাপছাড়ার মতো খানিকটা শূন্যে ঝুলে দ্বিতীয় লাইনে ছন্দের সঙ্গতি পায়, সম্পূর্ণতা পায়।

যে-সব বিদ্যের বাহাদুরি দেখাবে ব'লে গোবিন্দ বাড়ি থেকে তৈরি হয়ে আসে, সেগুলো খইয়ের মতো ফুটিয়ে ফুটিয়ে ছুঁড়ে মারে, মাস্টারও বিদ্যে ফলাবার সুবিধে পায়। ওরা যেন আগে থেকে সল্লা ক'রে এসেছে।

মৈত্রেয়ী তাই অবাক হয়ে শোনে—খাতায় কিছুকিছু টুকেও নেয় হয়তো।

ছুটি হয়ে গেল, গোবিন্দ এখনও বাড়ি যাচ্ছে না কি রকম! ওর কি পড়ার আর জায়গা নেই যে একেবারে করিডোরের রেলিঙে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েই নিজেকে জাহির করতে হবে? মনে হয়, মৈত্রেয়ীর সঙ্গে কি যেন একটি কথা কইতে চায়।

কিন্তু কি কথা কইবে? বলবে কি, মিকাল-এঞ্জেলোর 'মালা ও মেখলা' কবিতাটি ভারি সুন্দর, ল্যাম্ব ভারি দুঃখী ছিল—আপনিই শেলির 'উইচ অফ অ্যাটলাস'!

কি কথা কইবে?

বললাম—আপনি তো এবার বাড়ি যাবেন। ট্র্যামে?

—হ্যাঁ। আপনি? পায়ে হেঁটেই নিশ্চয়।

ওকে রাস্তায় এগিয়ে দিই। হাত দেখিয়ে ট্র্যাম থামাই, ও ওঠে।

বলি—বনজ্যোৎস্নাকে ভুলবেন না।

ও শুনতে পায় না, চেয়ে থাকে। এবার আর নমস্কার করি না।

পানের দোকানের আয়নাটার দিকে চেয়ে থাকি একদৃষ্টে।

পুতলি কৌতূহলী হয়ে শুধোয়—কি দেখছ ?

—নিজেকে। এই তেজী দেহটাকে। আর কিছুই চাই না পুতলি, চলতে পাই যেন—নিজেকে যেন টেনে নিয়ে যেতে পারি। নাই বা হলাম বে'ন, নাই বা আড়তদার।

সৌম্যের বিষণ্ণ বিবর্ণ মুখ চোখে ভাসে—ও যেন ভাগ্যের বাজে রসিকতা। ও যেন অকারণ।

বলি—আর যেন এমনি প্রাণ থাকে—লেলিহান। আমি সমস্ত রুদ্ধদ্বারের শক্তি পরীক্ষা করব, সমস্ত অবগুণ্ঠনের শুচিতা—পা ফেলে যাব সকলের বুকে করাঘাত ক'রে, করস্পর্শ ক'রে।

ভুলে যাই যে পান বেচছে, সে মৈত্রেয়ী নয়।

মাঝে কিসের লম্বা ছুটি।

গতানুগতিক ভাবে একটা চিঠি এল—মৈত্রেয়ী চসার-এর নোট চেয়ে পাঠিয়েছে আমার কাছে! ঐটুকুই আব্রু, ঐটুকুই কৃত্রিমতা। পরে লিখেছে—বনজ্যোৎস্নার কথা সেদিন সমস্ত শোনা হয়নি। দয়া ক'রে আসবেন একদিন। কালই আসুন না। না এলে কিন্তু ভারি দুঃখিত হব।

না এলে কিন্তু—এর পরে কি লিখে যেন কেটেছে কালি দিয়ে—আলোয় ধ'রে দেখি, লিখেছে—না এলে কিন্তু ভারি রাগ করব।

বেলা যেন ভাদুরে কুঁড়ে, কাটতে চায় না। কিন্তু সন্ধ্যা কাবার ক'রেই গেলাম। চসার-এর নোট কোথায় পাব—গোবিন্দের কাছে চেয়েও লাভ নেই—সমস্ত হৃদয় বনজ্যোৎস্নায় ভরে নিলাম।

সাদাসিধে দোতলা বাড়ি, দোরের গোড়ায় আর সন্ধ্যাদীপ নয়—মৈত্রেয়ী নিজে।

মৈত্রেয়ী খুশি হয়ে বললে—সেই কখন থেকে আশা ক'রে আছি। তবু এসেছেন যা হোক। ভাবলাম, চিঠিই পাননি হয়তো। আসুন ভিতরে।

নোটের কথা জিজ্ঞাসাও করে-না।

আজকে ওর খালি দুটি পা—আটপৌরে একখানা শাড়ি, গরিবের ঘরের মেয়ের মতোই নম্র, সলজ্জ। মাথার কাপড়টা শিথিল, চুলের সঙ্গে সেফটিপিন দিয়ে আঁটা নয়—গায়ে শাদা সেমিজ, মনিবন্ধ পর্যন্ত নামিয়ে-দেওয়া ফুলহাতা ব্লাউজ নয়—ওর হাত দুটি দেখি, হাত দিয়ে নয়, চোখ দিয়ে ছুঁয়ে শীতল হই।

ওর পড়ার ঘরে আসি, ফিটফাট—ওরই মতো লক্ষ্মী ঘরখানা। বসতে দেয়। মা আসেন। ব'লে দিতে হয় না, উঠে প্রণাম করি। গল্প চলে। ছোট বোন খাবার নিয়ে আসে—গন্ধমাদন পর্বতের মতোই ভারী।

বলি—কে কোথায় আছে ডাকুন সবাইকে, সারা রাত ব'সে খাওয়া যাবে। মৈত্রেয়ীও আমার সঙ্গে মুখ নেড়ে নেড়ে খায়।

কত কথা চলে—গ্রীক্ ট্রাজেডি, জোকাস্টা—পরে ওফিলিয়া, আরও পরে গ্রেচেন্।

মা মৈত্রেয়ীর কথা উল্লেখ ক'রে বলেন—ও একেবারে একা প'ড়ে গেছে। ওকে তোমরা একটু সাহায্য ক'রো কি পড়তে হবে না-হবে।

মৈত্রেয়ীর বাবা বুড়ো মানুষ—দরাজ হাসি—এমন চমৎকার মিশতে জানেন। আমি যেন কোথাও পেরেক হয়ে ফুটে রইনি—জলস্রোতের মতো মিশে গেছি। উনি ঘাড় চাপড়ে বললেন—এই তো চাই, কলম যদি না বাগাতে পার হাতে হাতুড়ি তুলে নিও—লাঙল, লাগাম, লাঠি—

যা হাত চায়। আমি তাই মনে করেই আমেরিকায় পালিয়েছিলাম। বললাম—কিন্তু আপনি তো হাত ভ'রে টাকার থলি নিয়ে এসেছিলেন—কি তাঁর হাসি, জোয়ারের জলধ্বনির মতো—যেন তাঁর টাকার থলেটা মেঝের উপর উজাড় ক'রে ঢেলে দিলেন।

মৈত্রেয়ী বললে—চলুন, ছাদে যাই। এ-ঘরে বনজ্যোৎস্না কক্‌খনো আসবে না।

ওর বাবা বৈঠকখানায় যেতে যেতে শুধু বললেন—রাতে ওঁকে ভাত খাইয়ে তবে ছেড়ো। পড়া-পত্রের সব খোঁজখবর নিয়ে রেখো, মা। হ্যাঁ, কাঞ্চন, বিশেষ কোনো কাজ না থাকলে এখানে তো থেকেও যেতে পার আজ। তোমার সঙ্গে ওয়ালটার পেটার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ না হয় বিতণ্ডা করা যেত এর পরে। তুমি যে-রকম ভক্ত পেটারের!

মৈত্রেয়ী আমাকে ছাদে নিয়ে আসে, চেয়ার না এনে একটা পাটি বিছিয়ে দেয় শুধু। আলিসায় একটি সলজ্জা রজনীগন্ধা মৃদু কটাক্ষ করে, তারারা পরস্পরের কানে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কি কথা কয়, সবাই কৌতূহলী হয়ে ঝুঁকে প'ড়ে আমাদের দেখে।

মৈত্রেয়ী একটু দূরে বসে—ওর সোনার দুটি চুড়ি হাত নড়ার সঙ্গে একটু একটু বাজে—তাই শুনে বাতাস একটু সচকিত হয়। হঠাৎ ছাদে এসে রজনীগন্ধার কানে কি ইঙ্গিত ক'রে যায়। মৈত্রেয়ী বলে—বলুন।

—আমি তখন মাঝি ছিলাম—

—মাঝি ছিলেন? তার মানে?

—তার মানে একটা ডিঙি ছিল, আমি বৈঠা টেনে টেনে পদ্মা ধলেশ্বরী মেঘনা শীতললক্ষ্যা পাড়ি দিতাম।

—খুব চমৎকার তো? ভয় করত না?

—করত না আবার ! ভয় করত ব'লেই তো ভালো লাগত।

—কেন মাঝি ছিলেন ? কেন ? বলুন না।—যেন কান্নার স্বর !

ব'লে চলি—নদীর ওপরেই থাকতাম, নৌকোয়। নিজেই রাঁধতাম, নৌকো জলে ভাসিয়ে দিয়ে হুঁকো নিয়ে ব'সে থাকতাম। সেবার পুরো তিন দিন নৌকো নিয়ে টো টো করেছি, একটাও জুৎসই কিরায়া পাইনি, সাহানার স্বরের মতো আমার না' ভেসে চলেছে। ঝড় উঠবে ব'লে বন্দরে এস্তেলা দিয়েছিল, তাই ভীতু বৌটির মতো নৌকোকে পার ঘেঁষিয়ে নিয়ে চলছি। বৈঠা টানি আর চারদিকের অপূর্ব তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখে মনে মনে মেতে উঠি, গ্রহ তারা আকাশ অন্ধকার তরু লতা সবাইকে সম্বোধন ক'রে ধন্যবাদ জানাই এই স্বাস্থ্য এই পরমায়ু পেলাম ব'লে, নদীস্রোতকে নমস্কার করি—প্রাণে এই চলার বেগ এসেছে ব'লে। শঙ্খচিল ঝাঁক বেঁধে উড়ে যায়—তাই দেখি।

অনেক দূর চলে এসেছি নিশ্চয়ই—পুবো কোণে কালো মেঘ তাল পাকাচ্ছে কে—ঘুমন্ত করুণ গ্রামখানি, অবগুণ্ঠিতা বধূটির মতো, বিরহরাতের নেবানো বাতিটির মতো ! পার থেকে কারা আমাকে ডাকলে—সারা রাত তাদের আজ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে—এদিকে ওদিকে, জল যেদিকে ঠেলে, তল যেদিকে ডাকে।

বললাম—ঝড় উঠবে যে, ইষ্টিশানে লাল বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

মেয়েটির আবাঁধা চুলের সঙ্গে শাড়ি ওড়ে, বলে—উঠুক ঝড়। ঝড়কে কি ডরাই ?

না, ও যেন ঝড়কে ভালোবাসে—সেই ভরসায়ই নৌকোয় উঠল। কিন্তু ঝড় এল না। পুঞ্জিত নিঃশব্দ প্রশান্ত দুঃখের মতো সান্দ্র সুনিবিড় অন্ধকার। মৈত্রেয়ী বললে—বেশ, আস্তে আস্তে বলুন, এখানেই থেকে যাবেন না হয়।

বলি—কলকাতায় ভালো প্র্যাকটিস জমল না প্রবোধের। গাঁয়ের একটা হেডমাস্টারি নিয়ে চ'লে এসেছে। সঙ্গে ওর খুড়তুতো ভাইটি—যিনি আগে এই শহরেরই একজন কণ্ট্রাক্টার ছিলেন—হঠাৎ সেই গাঁয়েই এক কবিরাজি ডিসপেন্সারি খুলে বসল। প্রবোধের আরও দুটি ছেলে হয়েছিল—ক্রিম আর সানইয়াৎ—বনজ্যোৎস্নাই নাম দিয়েছে। ওরাও মারা গেছে।

—মারা গেছে? কিসে?

মৈত্রেয়ীর বুকে মাতৃব্যথা উদ্বেল হয়ে ওঠে যেন।

—সেই একই ব্যারামে। তেমনি—চোখে ঘা হয়ে, পচে নীল হয়ে। সেদিনকার অন্ধকার নিরালা রাতে নৌকো থেকে উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে বনজ্যোৎস্না অস্ফুটস্বরে পদ্মার কাছে হয়তো একটি সুস্থ নিষ্কলঙ্ক সন্তান কামনা করছিল। বললাম—কি দেখছেন নিচু হয়ে? ও শুধু বললে—নিজের মুখ!

মৈত্রেয়ী অস্থির হয়ে বললে—প্রবোধবাবুরও খুব অসুখ বুঝি? তাই ওঁকে নিয়ে রাত্রে নৌকো ক'রে হাওয়া খেতে এসেছিল?

—যাকে নিয়ে এসেছিল সে অসুস্থ বটে, কিন্তু সে প্রবোধ নয়। প্রবোধ তো ওকে জ্যোৎস্না ব'লে ডাকে, কিন্তু এ ওকে বন ব'লেই ডাকছিল। এ ওর ঠাকুরপো—সেই কণ্ট্রাক্টার।

মৈত্রেয়ী একেবারে অবাক হয়ে যায়, চেঁচিয়ে ওঠে—বলেন কি?

—আমি তো বলছি কিন্তু ওরা সারা রাত একটি কথাও বলতে পারল না। কত বাজে গল্প করল—অন্ধকারে ঘুমন্ত গ্রামগুলিকে কি অপূর্বভাবে অপরিচিত লাগছে, কয়টি তারা একসঙ্গে গোনা যায়, এখানে ডুবলে কোথায় কতদূরে মৃতদেহটা গিয়ে ভেসে ওঠে, ঝড় উঠবে না অথচ এমনি লাল বাতি জ্বেলে ভয় দেখাবার কি মানে—এই সব নিয়েই যত

কথা। কিন্তু এই অন্ধকারে নদীতরঙ্গের ওপর ওরা তো এই সব কথাই বলতে আসেনি। বনজ্যোৎস্না একবার জলের মধ্যে দু'খানি পা ডুবিয়ে ব'সেছিল, ছেলেটি বললে—অসুখ করবে, পা তোল। বনজ্যোৎস্না বললে—করুক। কিন্তু ঐ কথাটিই ওরা অন্য কি ভাষায় যেন ব্যক্ত করতে চায়, বলা যায় না। বনজ্যোৎস্না বলে—তোমার এবার ঘুমোনো উচিত, ঘুমোও। তার উত্তরে ছেলেটি বলে—অন্ধকারে নদীকে কি আশ্চর্য দেখায়! এই কি ঐ কথার উত্তর? নৌকোর দোলায় ছেলেটি ঘুমিয়েই পড়ে—পাটাতনের ওপর, বনজ্যোৎস্না বাইরে চেয়ে থাকে। একটু ছোঁয় পর্যন্ত না। আমাকে বলে—ভোর না হতেই কিন্তু ফিরিয়ে নিয়ে যেয়ো, যেখান থেকে তুলে এনেছিলে আমাদের—

মৈত্রেয়ীর হাতের সঙ্গে আমার হাতের কখন যে চেনা হয়ে গেছে, জানি না। বললে—তারপর?

—তারপর বনজ্যোৎস্নাকে ওর বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এলাম, আর ছেলেটি ওর খড়ের ঘরের ডিসপেন্সারিতে গিয়ে উঠল।

—তারপর?

—তারপর—এবার বাড়ি যাব।

—না, এখানেই থেকে যান, এত রাত্রে কোথায় যাবেন? শেষ ক'রে যান গল্পটা—বনজ্যোৎস্না কেমন আছে?

—না, যেতেই হবে আমাকে।—মানুষ আবার কেমন থাকে? এই-এক-রকম।

করিডোর-এ আলাপ করার সুবিধে হয় না সব সময়—তাই লিফটম্যানের

সঙ্গে ঠিক করা গেছে। ক্লাশ-ঘণ্টার মধ্যে দুজনে লিফটে সোফাটার ওপর ব'সে কথা কই—লিফটম্যান তিন-তলা আর চার-তলার ফাঁকে লিফট বন্ধ ক'রে আমাদের লুকিয়ে রাখে একটু। কেউ ঘণ্টা দিলে এমন বেমালুম ভাবে উঠে আসি বা নামি যেন হঠাৎ আমাদের দেখা হয়ে গেছে। মৈত্রেয়ীর সঙ্গে এতটা বোঝাপড়া—এতটা জানাশোনা।

সেদিন বারান্দায় দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল ছুটির পর।

মৈত্রেয়ী বললে—ঐ ভদ্রলোকটিকে চেনেন, ঐ নীল র‍্যাপার গায়ে—

—কেন?

—লোকটি ভালো নন।

—তার মানে? ভালো নন, কি ক'রে বুঝলেন? খুব মনীষা আছে তো আপনার?

ও বললে—আলাপ-সালাপ কিছু নেই, চিনি না শুনি না—আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম চুপ ক'রে, হঠাৎ কাছে এসে বললে—কাঞ্চনবাবুকে ডেকে দেব? কি অন্যায় বলুন তো?

—কেন, কিসের জন্য অন্যায়? ও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চায়, ওর তো কোনো রকমেরই ইনট্রোডাকশান নেই—ও তো আমার মতো সৌভাগ্যক্রমে বনজ্যোৎস্নার সঙ্গে পরিচিত নয়। ও যদি আপনার সঙ্গে কথা কইতে চায়—তার যদি কোনো সুন্দর ও সহজ সুযোগ না মেলে—তবে কি ক'রে আপনার কাছে এসে দাঁড়াবে শুনি?

—কথা কইবার কিই বা দরকার?

—আপনার হয়তো নেই, কিন্তু ওর দরকার আছে নিশ্চয়ই। আমি ওর সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।

মৈত্রেয়ী অস্ফুটস্বরে বললে—না, না। কি নাম ওঁর?

—গোবিন্দ।

মৈত্রেয়ী হেসে উঠল, নামটা ওর পছন্দ হয়নি।

—নিশ্চয়ই আলাপ করিয়ে দেব। শুধু নাম শুনেই এত বিতৃষ্ণা, গল্পের এক লাইন পড়েই ভালো হয়নি? তবে যাদের নাম সজনীকান্ত, হেরম্বচন্দ্র, রমণীমোহন—তাদের সঙ্গে আপনাদের মতো কোনো শিক্ষিতা আলোকপ্রাপ্তা মেয়ে কথাই কইবে না? অন্যায় যত, সব বুঝি ওরই—আপনার আর কিছু নয়। ডাকি গোবিন্দকে।

গোবিন্দ এসে দাঁড়াল—দুই চোখে অভূতপূর্ব বিস্ময়, অথচ নম্রতা—সহসা ও যেন অত্যন্ত সুন্দর হয়ে গেল। ওর অদ্ভুত বেশভূষা, অদ্ভুত মুদ্রাদোষ—সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে ওর মুখে হঠাৎ অনিন্দ্য কান্তি এসে গেছে। সমস্ত মুখে আর কোনো কাঠিন্য নেই, হাসি। গোবিন্দ যে হাসতে জানে, জানতাম না।

বললাম—এঁকে তোমার নোটগুলো দিতে পারবে, গোবিন্দ?

গোবিন্দ খুশি হয়ে বললে—কেন পারব না? বারে, খুব পারব। আজ সমস্ত দিন দান্তের সম্বন্ধে একটা খুব ভালো নোট টুকেছি—নিন, পড়তে পারবেন তো হাতের লেখা?

মৈত্রেয়ী খাতাটা নেয়, দু'চারখানি পাতা উল্টোয়, বলে—কেমন সুন্দর হাতের লেখা আপনার—আপনি খুব পড়েন। দান্তে তো এখনও শুরু হয়নি ক্লাশে।

মৈত্রেয়ীর চোখের ছোঁয়াচ লেগে গোবিন্দের চোখও অগাধ রহস্যে ভ'রে উঠেছে। বললে—না, কি আর পড়ি, বারো ঘণ্টাও হয় না। রোমান্টিক কবিদের সম্বন্ধে একটা নতুন বই এসেছে লাইব্রেরিতে—দেখবেন প'ড়ে, অদ্ভুত রকমের লেখবার কায়দা।

এমন সুন্দর ক'রে গোবিন্দ কথা কইতে পারে, কে জানত আগে? কপালের থেকে চুলগুলি মাথার উপর তুলে দেয়, তাও অতি সুন্দর ক'রে। ওর দাঁড়াবার ভঙ্গীটিও আজ হঠাৎ সুন্দর হয়ে গেছে। ওর মুখ লাবণ্যময় হয়ে উঠেছে—দুই চোখে তৃপ্তির অগাধ সুখ যেন।

পড়া-শোনার বিষয় আরও অনেক কথা হয়।

ট্র্যামে ক'রে মৈত্রেয়ীর সঙ্গে বাড়ি যাচ্ছি, দেখি—ফুটপাথে গোবিন্দ।

বলি—এস, এস, গোবিন্দ।

গোবিন্দ ছুটল চলন্ত ট্র্যাম ধরতে, কিন্তু খানিকদূর ছুটে নাগাল না পেয়ে থেমে গেল। তাই দেখে মৈত্রেয়ীর মুচকে মুচকে হাসি।

ট্র্যাম থেকে নেমে গেলাম।

উবু হয়ে পড়েছে এমনি বাড়ি—রোয়াকের উপর দাঁড়িয়ে ডাকি—গোবিন্দ।

হাঁটুর উপর কাপড় তোলা, সারা গায়ে ঘাম, হাতে একটা ঝাঁটা—গোবিন্দ বেরিয়ে আসে। বলে—কে, কাঞ্চন? এস, ঘরটা সাফ করছি।

ঘরে ঢুকে একটা দারুণ দুর্গন্ধ পাই—তক্তাপোশের তলায় ইঁদুর মরেছে, সমস্ত দেয়ালে থুতু সিকনি ছিটানো—কোণে কোণে আবর্জনার স্তূপ, যাচ্ছেতাই নোংরা ঘর।

সেই ঘরের কথা হঠাৎ আজ ওর মনে পড়ে গেছে। একে ধুয়ে মুছে একেবারে পরিষ্কার ক'রে ফেলতে না পারলে ওর যেন স্বস্তি নেই।

আমিও ওর সঙ্গে ঘর পরিষ্কার করতে লেগে যাই। বলি—এই ঘরেই বারো ঘণ্টা ক'রে পড়? এই ঘরে শোও—ঘুম আসে? গায়ের ওপর দিয়ে

ইঁদুররা হার্ডল-রেস করে না? টেবিলটা এই কোণে রাখ—একটা পায়া নেই আবার, দুটো পেরেক এনে দাও। দেয়ালের এ-জায়গায় একটা সুন্দর ছবি টাঙালে ভারি মানাবে।

গোবিন্দের প্রাণে যেন চৈত্র-রাত্রির চাঞ্চল্য এসেছে—অরণ্যের আনন্দ, ও মর্মরিত হচ্ছে, শুনতে চাইলেই শোনা যায়। বলে—একটা খুব জোরালো নোট টুকছি—বায়রনের। সেটাও মৈত্রেয়ীকে দিয়ে এস।

—তুমিই দিয়ে এস। ও তোমার কথা বলছিল সেদিন।

—সত্যিই ভাই, আমি তেমন পড়ি না, আরও ভালো ক'রে পড়তে হবে।

নোংরা ঘর উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। গোবিন্দের মনের আনন্দ যেমন ওর কদর্য দেহের উপর মূর্চ্ছিত, বিচ্ছুরিত হয়।

নোট নিয়ে গোবিন্দ নিজেই গেল। আমি বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলাম। ও খানিকক্ষণ একলা কথা বলুক।

অনেক পরে ও আসে, ততক্ষণ ফুটপাতেই পায়চারি করি। ও এসে একেবারে ঘাড়টা জড়িয়ে ধ'রে বললে—কি চমৎকার লোক ওরা সব! সুইনবার্ন-এর একটা খুব ভালো সমালোচনা বেরিয়েছিল, সেটা ও চেয়েছে। সব টুকতে হবে—দুবার ক'রেই। এই যাঃ, তুমি যে এসেছিলে এ-কথা বলতে ভুলেই গেছলাম। চল, ফিরে যাই।

বলি—পরে। এখন যদি কোনো কথা মনে হয়ে থাকে তোমার, তবে তুমি একলাই ফিরে যাও—আমার যাবার দরকার নেই।

সারা রাস্তা ও মুখর ক'রে চলেছে, কত গল্প যে করছে তার অন্ত নেই, মৈত্রেয়ীর মুখ দা ভিঞ্চির আঁকবার মতো, ট্র্যাম ভারি আস্তে চলে, আজকে বৃষ্টি নামলে ও নিশ্চয়ই ভিজবে—এমনি যত আজগুবি কথা। ক্লাশে যখন

ও তর্ক করে, তখন কথার মধ্যে কি কর্কশতা ছিল, সে তর্ক ছিল পুঁথি নিয়ে—আর এখনকার কথাগুলি কি করুণ, অথচ কি উচ্ছ্বসিত !
সব চেয়ে আশ্চর্য—ও সুন্দর ক'রে বসে, সব চেয়ে আশ্চর্য—ও আর দাড়ি খোঁটে না।

—এখনো আলো জ্বালিস নি, সৌম্য ?
—মদ খাচ্ছি।
ভিতর থেকে কথা আসে। চাপা, চুপসো।
আবার আসে—দোরটা শুধু ভেজানো আছে, ঠেলা দে।
ঘরে ঢুকে দেশলাই বার ক'রে জ্বালাতে যাই, সৌম্য বাধা দিয়ে বলে—না, থাক।
পরে কোণের দিক লক্ষ্য ক'রে বলে—বেশ। তুমি এবার যেতে পার।
অন্ধকার কোণ থেকে কে যেন উঠে দাঁড়ায়। মাথায় ঘোমটা। ঘোমটাটা অকারণে একটু টানে। মুখ দেখা যায় না। খোলা দরজা দিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।
বলি—কে ও ?
—আমার দিদি।
—কোন দিদি ? যিনি টাকা পাঠান ?
—হ্যাঁ। ওর মুখের দিকে তাকাতে পারি না, তাই আলোটা নিবিয়ে দিয়েছি। দেরাজের থেকে বোতলটা টেনে আন তো, আর একটু ঢালি।
বলি—দিদির সামনেই ?

—দিদি জানে, মদ না হলে আমার চলে না। যেমন আমি জানি—

থেমে যায়। ফের বলে—দিদি আর ভাই।

বলি—কেমন আছিস? জ্বর কত?

—জ্বর একটু আছে। আজও ওষুধ কেনা হল না, কাঞ্চন। তুই কেন তখন খবরের কাগজটা রেখে গেলি? একটা নতুন বইয়ের বিজ্ঞাপন দেখে লোভ সামলাতে পারলাম না। সাড়ে সাতটাকা।

আলোটা জ্বালাই। ওর কোলের উপর টকটকে লাল রঙের মোটা বই একটা।

ও বলে—আগাগোড়া রক্ত দিয়ে মাখা।

বলি—আর ওগুলো গিলিস না। এমন করলে আর ক'দিন বাঁচবি?

—আমিও তাই এতক্ষণ ভাবছিলাম। স্বস্তিতে শুধু দুটো নিশ্বাস ফেলবার জন্যে সবাই সমস্ত দুঃখকে উপেক্ষা করছে—খালি প্রাণটুকু ধ'রে রাখবার চেষ্টায়। মোড়ের ঐ দুটো-পা-খসা ঠুঁটো ভিখিরীটা পর্যন্ত। আমার দিদি পর্যন্ত! কেউই মরতে চায় না, কেন বাঁচবে, তাও পর্যন্ত প্রশ্ন করবার সময় নেই। বাঁচাটা যেন বহুযুগের সংস্কার।—বাকি মদটা কোণের ঐ মেঝের ওপর ঢেলে দে, ওখানে ব'সে দিদি অনেকক্ষণ কেঁদে গেছে। মদ দিয়ে চোখের জল ধুই।

—কি খাবি রাত্রে?

—সবাইকে বিয়ে করতে হবে এ যেমন সত্য নয়, সবাইকে বাঁচতে হবে—এও ততখানি মিথ্যা। কারু কারু পক্ষে তাড়াতাড়ি মরাটা সত্যি সত্যিই উচিত। কেন এসেছি—এ-কথা কেউই প্রশ্ন করে না, কিন্তু যদি কেউ করত তো উত্তর পেত—মরতে এসেছি। আমিও তাই মরতে চাই—মৃত্যুকে আবিষ্কার করবার জন্য আমার মন অস্থির হয়ে উঠেছে, মৃত্যু

কতখানি কদর্য, কতখানি নিষ্ঠুর, একবার দেখে নিই! আজ সমস্ত দিন ভ'রে কি স্বপ্ন দেখেছি, জানিস? হঠাৎ সৌরজগৎ থেকে বাতাস যেন লুপ্ত হয়ে গেছে, পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী—মানুষ জীব জন্তু পোকা পতঙ্গ গাছ লতা সব অসহ্য যন্ত্রণায় নিঃশব্দে ধুঁকছে, বাতাসের জন্য কাড়াকাড়ি, কামড়াকামড়ি লাগিয়েছে, দাঁত নখ দিয়ে চিরে চিরে আকাশকে রক্তাক্ত ক'রে ফেলছে—উঃ, তুই তা ভাবতেও পারবি না। নিশ্বাস, নিশ্বাস, সবাই শুধু নিশ্বাসটুকু নিতে চায়।

পরে বললে—ঐ দিকের তাকটা প্রায় ফাঁক ক'রে ফেলেছি, সব বইগুলি পুরনো বইয়ের দোকানে কাল বেচে টাকাটা দিদিকে দিয়ে আসতে হবে, কাঞ্চন। ও কাল কোথায় যেন যাবে। পারবি তো ভাই?

—কোথায় যাবেন?

—যার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল সে ছ'বছর জেল ভুগে বেরিয়ে এসে ওকে চিঠি দিয়েছে, বেচারার নাকি সাংঘাতিক অসুখ। তার কাছেই যাবে, টাকা চাইতে এসেছিল।

—কি ব্যাপার?

—সে একটা খুব পচা পুরনো গল্প, নাই শুনলি। বিয়ে হবার পর দিদিকে ওর স্বামী আর শাশুড়ী ঘরে ঝুলিয়ে রেখে লোহা পুড়িয়ে গায়ে ছ্যাঁকা দিত। স্বামী একটু আধুনিক ছিল, হাণ্টারের বাড়ি মারত। শাশুড়ী ছিল সাবেকি, দিদির হাতটা মেঝের ওপর রেখে নোড়া দিয়ে ছেঁচত, ইত্যাদি। তোর মুখ এত বিমর্ষ হচ্ছে কেন? এ-সব কিসের শাস্তি, জানিস?—ভালোবাসার। আমার তো এ-কথা ভাবতে আজও হাসি পায়। লোকে কেন ভালোবাসে? খুব মজার ব্যাপার আগাগোড়া।

—তারপর?

—তারপর দিদি পাগল হয়ে যায়, বেরিয়ে আসে। পাগলা গারদে বছর তিনেক থেকে ভেসে পড়ে। বছর খানেক আগে আমার সঙ্গে দেখা হল, সে ভারি করুণ, আমি তা ভাবতেও পারি না, কাঞ্চন। দিদি তার পিঠের ঘায়ের বীভৎস চিহ্নগুলি রাজপথে সবাইর চোখের সামনে উন্মুক্ত ক'রে ভিক্ষা করছে। তাতে জীবনধারণ করবার পক্ষে যথেষ্ট রোজগার হত না নিশ্চয়ই। তাই—

—আর ছেলেটি?

—দিদির স্বামী খুন হয়। সেই সন্দেহে ছেলেটিকে জেলে ঠেলে। ওর মরণাপন্ন অবস্থা নাকি—ও যেন সেরে ওঠে, দিদি যেন ওকে গিয়ে দেখতে পায়—মনে মনে এই কামনা করি। বিধাতার কাছে আমরা খুব বেশি প্রার্থনা তো করিনা, কাঞ্চন। তুই কালই যাস কিন্তু সকালে, বইগুলি বেচে আনা চাই। যদি কিছু বেশি থাকে, দু'একটা নতুন বই আনিস।

সারা রাত সৌম্যর শিয়রে ব'সেই কাটাতে হয়। ওর অবস্থা ভালো নয়। সকালবেলা বইগুলি ধামায় ক'রে নিয়ে যাই দোকানে। বেশি দাম দেয় না। নিজের থেকে কিছু দিয়ে টাকার সংখ্যাটা যথেষ্ট রকম ভদ্র ক'রে যাই দিদির সন্ধানে।

দিদি নেই। কাল রাতেই চ'লে গেছে। এক কাপড়ে। হতভাগ্য শিশুর মতো ঘরটা কাঁদছে।

ওর একটুও তর সয়নি, রাতের অন্ধকার ওকে ডাক দিয়েছে। দু'বছর পরে ওদের এবার প্রথম মিলন হবে, যা ওরা এত কালের জীবন ধ'রে চেয়ে এসেছে, নিজেদের সমস্ত লাঞ্ছনার বদলে বিধাতার কাছে বর চেয়েছে—কিন্তু এত দিনের তপস্যার পর মিলনের এ কি বেশ! এর জন্য এত প্রতীক্ষা!

ছেলেটি যেন বেঁচে ওঠে, দিদি যেন ওকে গিয়ে দেখতে পায়—মনে মনে বললাম। আকাশের তারা সেই কথা শুনল।

কিন্তু মাঝরাতে দোরের গোড়ায় তেমনি কান্না শুনি কেন? পুতলিকে শুধোই—পুতলি, দিদি কি ফিরে এল? ছেলেটির দেখা কি পেল না? ও কি নেই? না, আবার ওকে তাড়িয়ে দিলে ওরা?

দুজনে লণ্ঠন নিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। কিন্তু কই, কেউ নেই তো! মনে হয়, এ যেন এই বিরহী পাড়াটার কান্না! যাবার সময় এখানকার আকাশে দিদি তার কান্নাটি রেখে গেছে।

ছেলেটি যেন বেঁচে ওঠে, দিদি যেন ওকে গিয়ে দেখতে পায়—আবার প্রার্থনা করি।

পুতলিকে বলি—এক্‌জামিন খুব কাছে এসে পড়ছে। আমি মেসে যাচ্ছি, এবারে অনেকগুলি টাকা দরকার। কি বল্‌ দিয়ে ফেলি এক্‌জামিনটা?

ও বলে—নিশ্চয়ই! টাকার জন্য ভেবো না, সে হয়ে যাবে'খন। মেসে যাও, কিন্তু জলখাবারটা দোকানে এসেই খেয়ে যেও। আমি না হয় কোনো বাড়িতে বাড়তি সময় ঝি-গিরি করব।

মৈত্রেয়ীদের বাড়ি যাই। মৈত্রেয়ী পা দুলিয়ে দুলিয়ে গুনগুন ক'রে পড়ছে।

আমাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে উৎফুল্ল হয়ে বললে—এসেছ? কি ঘেমে এসেছ একেবারে, মুখ একেবারে মাটির মতো হয়ে গেছে। এখন জল চাও এক গ্লাশ!—বাস্তবিক, তোমাকে এবার থেকে দস্তুরমতো শাসন

করতে হবে। কি শাসন ? পিঠে চড় মারব, কথা কইব না, বেরিয়ে যাবার সময় দরজার দুধারে দুহাত মেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকব।

বলে, আর ওর শাড়ির আঁচল দিয়ে আমার মুখের ঘাম মোছে।

আমার হাত ধ'রে ওর চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলে—এবার লক্ষ্মী হাবা ছেলেটির মতো জিরোও খানিক—বাস্তবিক, তোমাকে নিয়ে আর পারি না—আমি হাওয়া করছি। তারপর স্নান ক'রে খেয়ে দেয়ে পাটি বিছিয়ে মেঝের ওপর দুজনে মিলে পড়া যাবে, দান্তেটা আজই তৈরি ক'রে ফেলব।

বলি—আমি কি খেয়ে দেয়ে তোমার সঙ্গে পড়তে এসেছি নাকি ?

—আচ্ছা, না হয় গল্পই করা যাবে সমস্তক্ষণ। যদি ঘুম পায়! বেশ, ঘুমিয়ে পড়ব—পাটি তো পাতাই থাকবে। আমার ঘুম পেতে দেখে তোমারও তখুনি ঘুম পাবে না আশা করি। তুমি গল্পই ব'লে চল—আমি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গল্প শুনব।

বলি—এইমাত্র গোবিন্দের কাছ থেকে আসছি। ওর পড়া শুনে এলাম।

ও আমার চুলে আঙুল বুলোতে বুলোতে বলে—হ্যাঁ, উনি প্রায় রোজ সন্ধ্যাবেলাই এখানে আসেন—প্রায় দু'হাজার পাতা নোট টুকেছেন—আমি ওঁর থেকে চারশো পাতা টুকে নিয়েছি। কি অসাধারণ মুখস্থ করতে পারেন, আর কি সুন্দর হাতের লেখা! অনেক প্রোফেসারের থেকে ওঁর পাণ্ডিত্য বেশি—এ-কথা আমি জোর ক'রেই বলতে পারি। তারিখগুলি পর্যন্ত সব মুখস্থ! কবে, কে, কোথায়, কি, কেন—কিছুই যেন ওঁর অজানা নেই। সত্যি, তুমি আমাকে মাপ ক'রো, আমি ওঁকে ভুল বুঝেছিলাম প্রথমে। কিন্তু তোমাকে দেখেই চিনে ফেলেছিলাম সব, প্রথম দিনেই তুমি পালিয়ে গেলে। তুমি পালিয়ে যাবারই ওস্তাদ।

মুখে বলে বটে, কিন্তু যেন বিশ্বাস করে না—এমনি ভাবে গলার কাছে হাত রাখে। ওর হাতখানা গালের কাছে টেনে আনি।

বলি—গোবিন্দের পড়া শুনে এলাম—সে কি পড়া! চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ ক'রে ফেলেছে, ও যেন কণ্ঠস্বর নিয়েই দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছে, কানে আঙুল দিলে পর্যন্ত সেঁধোয়। আর, কি খাটতেই যে পারে—বিকেলে বেড়াতে যাবে, তাও হাতে বই নিয়ে, ওর চোখ দুটো আর নেই। আমি শুধু শুধু পড়তে এসেছিলাম—কিছু হল না।

—আমারও না। আমার ভারি ভয় করে।

—তোমার আবার কি ভয়? কোনো রকমে আটটা দিন অন্তত লিখে এসে প্রোফেসারদের বাড়িতে গিয়ে গিয়ে তাদের চেয়ারে দিন কতক দয়া ক'রে ব'সে এলেই হল—ফার্স্ট ক্লাশ। তোমার আবার কি ভয়! সেদিন তো বোস বলছিলেন যে, তাঁর এত বৎসরের টিউটোরিয়্যাল-এ তোমার মতো এমন চোস্ত কাগজ দেখেন নি। তোমার টিউটোরিয়্যাল নেবার দিন থেকেই উনি গোঁফ কামিয়েছেন। তোমার কিসের ভাবনা?—হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি গোবিন্দকে তোমার কন্‌ভোকেশান-এর ফটোটা দিয়েছ?

—হাঁ, এত ক'রে চাইছিলেন।

—বেশ করেছ। ও সেই ফটোটা ওর টেবিলের সামনে দেয়ালে টাঙিয়ে রেখেছে। ও একটা ডুবো গাধাবোট ছিল, তুমি এসে তাতে পাল লাগিয়ে দিলে; ও একটা ঝুনো বাঁশ ছিল, তুমি ওকে বাঁশি বানালে।

—কি যে বল যা-তা, ককখনো কথা কইব না। তুমি ভারি··· একি, উঠছ যে?

—সত্যি। ও যেন কি একটা অসাধ্য সাধন করবে, তুমি কোনো দিন

আগ্নেয়গিরি দেখনি, না? ও তাই। আমি এবার যাই, তুমি লক্ষ্মীমেয়ের মতো পা দুলিয়ে দুলিয়ে আরও খানিকক্ষণ পড়।

—না না না, যেও না কিন্তু, তাহলে ভারি রাগ করব। কেন যাবে শুনি এই রোদ্দুরে? শরীরটাকে মাটি করলেই হল? যেও না বলছি, আমি সব নোট ছিঁড়ে ফেলব তাহলে।

—নোট ছিঁড়ে ফেলবে মানে? গোবিন্দ তোমার জন্যে যা স্বার্থত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করছে, তার জন্যে ওর কাছে তোমার চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত। উচিত ঐ নোটগুলো পূজো করা। বোকা মেয়ে। বোসো, পড়ো গুনগুন ক'রে।

বেরিয়ে যাই, ও রাগ ক'রে দরজাটা ঝনাৎ ক'রে বন্ধ ক'রে দেয়।

পরের দিন ফের কেঁদে-কেটে এক চিঠি লেখে। লেখে—নোট পূজো করছি বটে, কিন্তু তুমি এস।

বিরাট গৃহতল—চারশো ছেলে ডেস্ক-এর উপর মুখ গুঁজে পরীক্ষা দিচ্ছে—বিস্তীর্ণ প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা। এ যেন সৌম্যর সেই গুদাম-ঘরটা—সবগুলি মস্তিষ্ক টগবগ ক'রে ফুটছে, এ যেন প্রকাণ্ড একটা কারখানা, এ যেন ভাষার মঞ্জরীতে বিকশিত হবার জন্য কোটি কোটি ভাব-ভ্রূণের অসহ্য নিদারুণ সংগ্রাম!

কি লিখব, ভেবে কিছুই কিনারা পাই না—চেয়ে চেয়ে দেখি—একটা ঘুমন্ত পুরীতে এতগুলি ছেলে মশাল হাতে কি যেন অনুসন্ধান করছে, পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে, কি চায়, কেই বা জানে।

হয়তো একটি সহজ স্বচ্ছন্দ জীবন—পুত্রপরিবার, শোক, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু! গোবিন্দ একটা দেখবার জিনিস, ও একটা বয়লার, ভূমিকম্পের সময়কার পৃথিবী, তারা ফোটবার আগেকার আকাশ। পাতার পর পাতা মুহূর্তে লিখে ফেলছে, ওর কলম পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো টগবগিয়ে ছুটেছে—বেদুইনের ঘোড়া! ওর টেবিলের সামনে মৈত্রেয়ীর যে কটো টাঙানো আছে, সে-কথাও হয়তো এখন আর ওর মনে পড়ছে না—কে জানে, হয়তো বা বেশি ক'রেই পড়ছে।

আরেকজনের কথা মনে পড়ে—ভাঙা ক্যানভাসের ইজিচেয়ারটায় শুয়ে মৃত্যুকে ডাকছে।

মৈত্রেয়ী ঐ দূরে ব'সে আছে, চাদরটা পিঠের উপর দিয়ে এমন ভাবে জড়িয়ে নিয়েছে যেন ভয় পেয়ে গেছে।

ফাঁকা খাতাটা সাবমিট ক'রে মৈত্রেয়ীর পাশ দিয়ে বোঁ ক'রে বেরিয়ে গেলাম বাইরে।

বারান্দায় আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কে বললে—একটা ট্যাক্সি ডাক।

ট্যাক্সি ডাকলাম। মৈত্রেয়ী আমার গা ঘেঁষে ব'সে বললে—ছাই একজামিন। কি হবে আমাদের পাশ ক'রে? বাবাঃ, প'ড়ে প'ড়ে বুড়ো হয়ে গেলেও আমার সাধ্যি নয়, তোমারও নয় হয়তো। আমাদের ওরা সব কি রকম দেখছিল—যেন আমরা—

কথা শেষ করবার আগেই হেসে ওঠে। গায়ের থেকে চাদরটা সরিয়ে নেয়। বলে—আজ পাঁচটা পর্যন্ত ট্যাক্সিতে ঘুরে আমাকে নিয়ে তোমার বাড়ি যেতে হবে। আজ রাত্রেই বাবাকে বলতে হবে কিন্তু।

—কি বলতে হবে? বিয়ের কথা?

আমার কাঁধের উপর মুখ রেখে বললে—আরও। দান্তের যেমন বিয়াত্রিচ,

পেত্রার্কের যেমন লরা, কাতুল্লুসের যেমন লেসবিয়া, মিকাল এঞ্জেলোর যেমন ভিটোরিয়া কলোনা—তেমনি আমি তোমার। তোমার।
অবগাঢ় দুটি চোখ, দ্রাক্ষালতার মতো দেহ, কথায় কি করুণা!
ওই যেন আমার নীল ফুল, নীল পাখি, নীল নভতল!
সামনে যে ফাঁকা পথ দেখে, সেই পথেই ট্যাক্সি ছোটে, ও ওর দুটি ব্রততীপেলব বাহু আমার গলায় জড়িয়ে দিয়ে ওর বুকের কাছে আকর্ষণ ক'রে বলে—সত্যি বল, বলবে আজ? তার জন্যেই তো তোমাকে দেখে হল্ থেকে পালিয়ে এলাম। আমার পাশ ক'রে কোনো কাজ হবে না। তুমি মুখ ও-রকম ক'রে রয়েছ কেন? আজ হাসতে বুঝি ভুলে গেলে একেবারে—তোমার এত কাছে আমি—
বলি—তুমি কি হঠাৎ ক্ষেপে গেলে, মৈত্রেয়ী? এক্‌জামিন দিতে এসে তোমার মাথার ঠিক নেই।
—ঠিক নেই? মাথার ঠিক না থাকলে তোমার বুকের ওপর ককখনো এমনি ক'রে মাথা রাখতাম না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি—তোমার দুটি পা আমাকে দাও। তুমি কি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নমালার মতোই নিষ্ঠুর, নিরুত্তর?
—কিন্তু মৈত্রেয়ী, বিয়াত্রিচকে কি দান্তে বিয়ে করেছিল?
—নাই বা করুক, কিন্তু আমি তোমার ব্যারেট, তোমার মেরী, তোমার ডার্ক-লেডি।
—এ অসম্ভব প্রলাপ বোকোনা, মৈত্রেয়ী। কি চাও তুমি আমার কাছে?
—কিই বা না চাই? তোমার কাছে চাই প্রেম, সন্তান, সংসারজীবন—তোমার পায়ের ওপর মাথা রেখে উদার মৃত্যু। আরও চাই, আরও চাই—কি চাই, সত্যিই বলতে পারছি না।

—গ্রেচেনের বুকে বুক রেখে ফাউস্টের ক্ষুধা মেটেনি, মৈত্রেয়ী, তা তো তুমি জান। আমাকে ও-রকম ভাবে সত্যি ডেকো না। আমার কত কাজ, আমার বিশ্রাম করবার সময় নেই এতটুকুও।

মৈত্রেয়ী মুখ বিবর্ণ ক'রে বলে—কি কাজ শুনি ?

—ধর, এই দেশের কাজ—

—কেন, আমি তোমাকে সাহায্য করব, তুমি যদি বেদে হও আমি বেদেনি, তুমি যদি দাঁড় টান আমি হাল ধ'রে থাকব, তুমি লাঙল চালাও আমি মাটি নিড়োব, তুমি যদি কামার হয়ে লোহা পেট, আমি আঁচল ভিজিয়ে তোমার পিঠের ঘাম মুছে দেব—

—লাভের মধ্যে তাহলে কোনো কাজই এগোবে না। এবার বাড়ি ফিরে চল, মৈত্রেয়ী। তুমি বৃথা দুঃখিত হয়ো না। আজ রাতটা ভালো ক'রে ঘুমিয়ে কাল সকালে উঠেই তোমার বোকামি বুঝতে পেরে তুমি হাসবে। আমি একটা কি ? চালচুলো নেই, মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই, আমার মধ্যে স্থিরতা নেই, সামঞ্জস্য নেই। আমি কাউকে এত ভালোবাসতে শিখিনি মৈত্রেয়ী, যে, সারাজীবন তাকেই ভালোবাসব।

মৈত্রেয়ী আর কোনো কথা কয় না, চাদরটা তেমনি গায়ে এঁটে দেয়, হাঁটুর ফাঁকে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে কাঁদে।

ট্যাক্সি ফিরে চলে।

বাবা বলেন—একজামিন দিতে পারিসনি, তাতেই এত কান্না ? তুই হলি কি, মা ? ভালোই তো হল, আরও মাস ছয়েক নিশ্চিন্ত থাকতে পারবি, —খুব ক'দিন এখন ফুর্তি ক'রে নে না।

মৈত্রেয়ী বিছানায় লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদে। ও চায় প্রেম, ও চায় সন্তান, ও চায় সংসারজীবন।

তারপরে একদিন রেজাল্ট বেরোয়। গোবিন্দ একেবারে ডগায় এসে উঠেছে—ফার্স্ট ক্লাশ ফার্স্ট। সবাই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেছে—একটা পুঁচকে, খোট্টা-মাফিক ছেলে, বই মুখস্থ-করা পড়ুয়া—সে কিনা সবাইকে ডিঙিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে গেল! অদ্ভুত না?

গোবিন্দর সঙ্গে দেখা। বললে—মৈত্রেয়ী নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছে। পাশ করতে না করতেই ব্যাঙ্কে চাকরি পেয়ে গেলাম, ভাই। খুব ভালো স্টার্ট, কয়েক বছরেই হাজারে দাঁড়িয়ে যাবে—একের পিঠে তিন শূন্য।

উৎফুল্ল হয়ে বলি—বেশ। খুব খুশি হলাম, গোবিন্দ। বিয়ে-থা করছ তো?

ও বলে—এই মাসেই জয়েন করতে হবে, পাটনায় ঠেলেছে প্রথম। সব গোছগাছ ক'রে নিতে হবে এরই মধ্যে। কিছু টাকা জমাতে পারলেই ভবানীপুরের দিকে ছোটখাটো একটা বাড়ি ক'রে ফেলব—তোমার তো খুব ভালো আইডিয়া আছে এ-সম্বন্ধে—মৈত্রেয়ী বলেছে একতলার ওপর ছোট্ট একটি ঘর তৈরি করতে—এমনি বলেছে। চাকরিটা পেলাম ব'লে ছোট ভাইটাকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দিতে পারব।

ওর কথাগুলি যেন ফুলঝুরি। ও যেন দৌড়ে চলে—ওকে সত্যিই কত সুন্দর, সাবলীল, সমৃদ্ধ দেখাচ্ছে। গায়ে তসরের পাঞ্জাবি—তাঁতের কাপড় —হাতে একটা স্টিক পর্যন্ত। ও যেন রূপকথার রাজপুত্র। রাক্ষসপুরী থেকে বেরিয়ে এসেছে। চমৎকার ওর চলা।

সকালবেলাও সৌম্য বলছিল—ঐ নতুন বইটা থেকে কয়েক পাতা পড়ে শোনা, কাঞ্চন। বড্ড অস্থির লাগছে।

ডাক্তার এসে আশা নেই ব'লে গেছে। যেটুকু ওরা বলতে পারে।
দুপুর বারোটা থেকে প্রলাপ শুরু হয়েছে। সমস্ত বাড়িটাতে কেউ নেই যে আমাকে সাহায্য করে, কেউ আপিস কেউ দালালি করতে বেরিয়েছে। শুধু চুপ ক'রে চেয়ে থাকার চেয়ে বেশি কি আর করা যাবে? কিছু একটা না করলে স্বস্তি পাই না ব'লে মাঝে মাঝে চামচে ক'রে একটু একটু ওষুধ, গরম দুধ ওর দাঁতের ফাঁক দিয়ে ঢেলে দিই, গিলতে পারে না। হাতে পায়ে গরম জলের ফোমেণ্ট করি—একেবারে একা।
নিচে মেঝের উপর অনেকক্ষণ বিছানা ক'রে রেখেছি, কিন্তু শোয়াবার উপায় নেই। ও ওর অনেক দিনকার পুরনো ভাঙা চট-ছেঁড়া ইজি-চেয়ারটায় শুয়েই মরণকে আলিঙ্গন করবে।
ও হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে—আমাকে ওরা সবাই নিতে এসেছে, কাঞ্চন। পাজীটা, চুপ ক'রে আছিস কেন, সবাইকে ডাক, শাঁখ বাজাক, ওদের বসবার জায়গা ক'রে দে, হতভাগা। কত যুগের কত কবি, কত লেখক, কত উপোসী—মিছিল ক'রে এসেছে। অনেকের মুখ চিনি না, কিন্তু সবাই আমাকে বলছে আত্মীয়, বন্ধু, ভাই। আমার হাত ধ'রে একটুখানি এগিয়ে নিয়ে যা, ওদের হাতের সঙ্গে হাত মেলাতে দে—
খানিক বাদে আবার বলে—মা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে স্বপ্ন দেখি। ঐ যাঃ, ছোট বোনটা জলে প'ড়ে গেল, লাফিয়ে পড়, কাঞ্চন। আমার একটি মাত্র নিষ্পাপ বোন—ওর পিঠেও ওরা চাবুক মারছে? সত্যি ক'রে বল, কাঞ্চন, সেই ছেলেটি সেরে উঠেছে তো? দিদি ওর দেখা পেয়েছে?
—পেয়েছে বৈকি। তুই দেখতে পাচ্ছিস না?
—না। আমার সব অন্ধকার হয়ে আসছে, আমি কোথায় যেন চলেছি,

কত দূরে। সেখানে একটি তারার কণিকাও নেই। আমাকে জোরে টেনে ধর, কাঞ্চন, যেতে দিস্ না।

ওকে আর রাখা যাবে না। গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

কোলাহল ও আর্তনাদ শুনে দোতলার নববধূটি দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে—সলজ্জ প্রতিমার মতো। মৃত্যুর মতো।

সৌম্য শেষবার ব'লে উঠল—চিতায় শোয়াবার সময় আমার মাথার তলায় এই লাল বইটা দিস, কাঞ্চন। আর এই লাইব্রেরিটা—তুই তো একে ঘাড়ে ক'রে বেড়াতে পারবি না, কাউকে দিয়ে দিস আমার নাম ক'রে—

চেঁচিয়ে উঠি—সৌম্য, সৌম্য!

সৌম্যর জবাব কানে এসে পৌছয় না। শুধু খোলা জানলা দিয়ে সন্ধ্যাতারা মাটির বুকে ওর ক্ষীণ সান্ত্বনাটি পাঠিয়ে দেয়। বিকেলের হাওয়া ব্যাকুল হয়ে ফেরে।

সৌম্যর কথা রাখলাম।

গৌবিন্দ ও মৈত্রেয়ীর বিয়েতে ওর লাইব্রেরিটা গোবিন্দকে দিয়ে এসেছি।]

'বেদে' অচিন্ত্যকুমারের প্রথম প্রকাশিত রচনা। উনিশ বছর আগে বইখানা পড়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত
৩০ গিরীশ মুখার্জি রোড
ভবানীপুর

কল্যাণীয়েষু,

তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি। তোমার শক্তির বিশিষ্টতা আছে। সেই শক্তি যদি কিছু পরিমাণে আত্মবিস্মৃত হ'ত তবে ভালো হ'ত। রচনার যে বিশিষ্টতা বাহ্যিক, তোমার পক্ষে তার প্রয়োজন ছিল না। যারা অল্পশক্তি তারাই রচনায় নূতনত্ব ঘটাতে চায়—চোখ ভোলাবার জন্যে। কিন্তু যখন তোমার প্রতিভা আছে তখন তুমি চোখ ভোলাবে কেন, মন ভোলাবে।

তোমার কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ও অজস্র বৈচিত্র্য দেখে আমি মনে-মনে তোমার প্রশংসা করেছি। সেই কারণে এই দুঃখ বোধ করেছি কোনো-কোনো বিষয়ে তোমার অত্যন্ত পৌনঃপুন্য আছে—বুঝতে পারি সেইখানে তোমার মনের বন্ধন। সে হচ্ছে মিথুনপ্রবৃত্তি। সে প্রবৃত্তি মানুষের নেই, বা তা প্রবল নয় এমন কথা কেউ বলে না। কিন্তু সাহিত্যে সকল বিষয়েই যেমন সংযম আবশ্যক এক্ষেত্রেও। ঘুরে ফিরে কেবলি একটা জিনিষকেই প্রকাশ করার দ্বারা দুর্বলতাজনিত প্রমত্ততার প্রমাণ হয়—তাতে রচনার সামঞ্জস্য নষ্ট করে।

যে মানুষ মাটির কাছাকাছি আছে তাকেই তুমি নানা দিক থেকে দেখাতে গিয়েছ। কিন্তু আমার বিশ্বাস মিথুনাসক্তি সম্বন্ধে তারা এত অধিক বুভুক্ষু নয়—অন্তত আমাদের দেশের হিন্দুজনসাধারণ। এসম্বন্ধে উগ্রতা নরোয়ে প্রভৃতি দেশের সাহিত্যে দেখেছি। দেখে আমি এই মনে করেই বিস্মিত হয়েছি যে আমাদের দেশের মানুষের এই ব্যাপারে এমনতর নিত্যজাগ্রত লালসা নেই। (পল্লিগ্রামের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে।) আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে এই প্রবৃত্তির উৎসুকতা অনেকের মধ্যে আজকাল দেখা যায়—তার প্রধান কারণ মানুষের জীবন-ক্ষেত্রের বিচিত্রব্যাপারে তাদের ঔৎসুক্য নেই—সেই কারণেই এই এক নেশা নিয়েই তারা নিজেকে ভোলাতে চায়। নরোয়ে প্রভৃতি দেশের লোকের বলিষ্ঠ প্রাণশক্তির মধ্যে প্রবৃত্তির যে সহজ উত্তাপ আছে, এদের তা নেই—এদের আধমরা দেহমনের এই একটিমাত্র উত্তেজনার উপকরণ আছে—আর কিছুতেই যেন এদের সম্পূর্ণ জাগাতে চায় না। এই কারণে আমাদের সাহিত্যে যখন এই মিথুনাসক্তির লীলা বর্ণিত দেখি তখন তার সঙ্গে-সঙ্গে দুর্দাম বলিষ্ঠতার পরিচয় পাইনে—সেইজন্যে ওটাকে অশুচি রোগের মতই বোধ হয়। রোগ জিনিষটা দুর্বল চিত্তের পক্ষে সংক্রামক—বিকারমাত্রই অবলীলাক্রমেই শক্তিহীনকে জীর্ণ করে। এই কারণে উত্তর য়ুরোপে দানবতুল্য দেহে মদের পিপাসা সহজেই সহ্য হয়, অর্থাৎ তাকে অতিক্রম করেও তাদের মনুষ্যত্ব অবিচলিত থাকে। আমাদের ক্ষীণজীবীর দেশে মদ খেতে গেলেই মানুষ একান্ত মাৎলামিতে গিয়ে পৌঁছয়—এই জন্যে নরোয়েতে যেটা দৃষ্টিকটু নয় আমাদের দেশে সেটা কুৎসিত। অন্যান্য বিচার সম্বন্ধেও তাই। আমাদের সাহিত্যে বারে-বারেই কেবলি দুর্বল রুগ্ন মুমূর্ষুদের লালায়িত লালসার অতিবর্ণনায় আমরা মানুষের যে

মূর্ত্তি দেখি সেটা বীভৎস—তার আনুষঙ্গিক ভাবে প্রবল-প্রবৃত্তিশালী চিত্তের প্রচণ্ডতা দেখতে পাইনে বলে অত্যন্ত ঘৃণা বোধ হয়। এরকম রোগবিকারের বর্ণনাস্থান সাহিত্যে নয়, এটা ডাক্তারি শাস্ত্রে শোভা পায়।

তোমার বর্ণনীয় চরিত্রে মাটির সকল প্রকার সৌন্দর্য্যের প্রতি মানুষের অনুরাগ তুমি উজ্জ্বল করে দেখাতে চেষ্টা পেয়েছ। এটা ভালোই। কিন্তু আমার সন্দেহ হয়েছে এটা তুমি বিশেষ চেষ্টা করে করেছ। বোধ হয়েচে তুমি আধুনিক কোনো-কোনো বিখ্যাত লেখকের রচনায় মাটির প্রতি মানুষের প্রবল আকর্ষণের বর্ণনা দেখেচ, সেইটের প্রভাব ভুলতে পারনি। এ কথা মনে হবার কারণ এই যে, যে শ্রেণীর লোক মাটি নিয়েই চিরজীবন কাটায় তারা মাটিকে প্রাণপণে ভালবাসে—সেই ভালবাসা আসক্তি—তার সঙ্গে-সঙ্গে সৌন্দর্য্যভোগ যদি বা থাকে তবে সেটা অর্দ্ধসচেতন, সেটা মূক। কিন্তু তোমার বর্ণিত চরিত্র মাঝে মাঝে যে রকম করে এ সম্বন্ধে ভাব প্রকাশ করেচে তাতে মনে হয়েচে তুমি যেন নিজে গায়ে পড়ে তাদের উপর এই জিনিষটা আরোপ করেচ—মনে করেচ এটা শোনাবে ভালো। এদের মধ্যে যেটা অবচেতন ভাবেই আছে তাকে যদি সেই ভাবেই তুমি আভাসে প্রকাশ করতে পারতে তবে তাতে তোমার প্রতিভা সার্থক হ'ত। রুষীয় লেখক চেকভের রচনায় এই রকম অনভিব্যক্ত আভাসের আশ্চর্য্য জাদু আমরা দেখেচি।

তোমার শক্তি এখনো যে আত্মপ্রতিষ্ঠ পরিণতিতে পৌঁছয়নি তার প্রমাণ তোমার ভাষায় উপমার সদাসচেষ্ট প্রয়াস। তোমার উপমা অনেক স্থলেই খুবই ভালো, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় তারা স্বস্থানে এসে পৌঁছতে যেন হাঁপিয়ে পড়েচে। তাদের অনেক সময়েই তুমি টেনে এনেছ।

তবু সব সত্ত্বেও তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি। তার স্বকীয়তা আছে—অজস্রতা আছে—আত্মশক্তির প্রতি পরিপূর্ণ ভরসা রেখে প্রশস্ত পটভূমিকার উপরে নানা চরিত্র ও বিচিত্র ঘটনা নিয়ে যে বৃহৎ চিত্র তুমি এঁকেছ তাতে তোমার লেখনীর আশ্চর্য্য বলশালিতা প্রকাশ পেয়েচে। একদিন পরিণতি সহকারে যখন তোমার প্রতিভা সরলতার ভঙ্গী ছেড়ে দিয়ে যথার্থ সরল হয়ে উঠবে, যখন সে বলিষ্ঠ তুলি দিয়ে মানুষকে বড়ো করে আঁকবে, সাহিত্যে চিরজীবী মনুষ্যত্বকে চিরন্তন আকার দেবে সেই দিন তুমি ধন্য হবে—বাংলা সাহিত্যে ভারতীর তুমি নূতন আসন রচনা করবে। সে দিন তোমার আসবে, এই আমি কামনা করি ও বিশ্বাস করি। এই পত্র থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে বিজ্ঞাপনের কাজে লাগিয়ো না এই আমার অনুরোধ। ইতি ৩১ আশ্বিন ১৩৩৫—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"কল্লোল" (১৩৩৬ বৈশাখ) পত্রিকায় এই চিঠিখানি প্রথম প্রকাশিত হয়।
শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুমতিক্রমে এই বইয়ে পুনর্মুদ্রিত।